ডাক হরকরা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ-চিত্র :
বিমল দাশ

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই :
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দু টাকা পঞ্চাশ ন. প.

এগিয়ে দীনুর কাছাকাছি এসে
এমন করে কে যায় ?

সেদিন বর্ষাকালের কৃষ্ণপক্ষের একটি ঘনমেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। সারাদিন প্রায় বর্ষণ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর বর্ষণ থেমেছে কিন্তু দুর্যোগ কাটে নাই। আকাশে দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘ রয়েছে। এলোমেলো বর্ষার বাতাস বইছে। বইছে প্রবল বেগেই। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশের মেঘের ঘন আবরণের ছায়ায় চামড়ার মতো পুরু হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যেন সে-অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে শুধু অসংখ্য লক্ষ লক্ষ জোনাকির জ্বলা আর নেভা। জ্বলছে আর নিভছে।

মধ্যে মধ্যে কোন দূর দিগন্তে মেঘ চমকাচ্ছে। তার ক্ষীণ আলোয় পারিপার্শ্বিকের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঘন অরণ্যভূমের মধ্যে একটি পথ।

মৃদু গম্ভীর মেঘগর্জন উঠছে পরপর। কিন্তু অবিরাম উঠছে গাছের সঙ্গে বাতাসের মাতনের শব্দ। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর, ঝর-ঝর। তার সঙ্গে ব্যাঙের উল্লাস-কলরব যুক্ত হয়ে একটি যেন ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। এরই মধ্যে বেজে চলেছে একটি ঝুন-ঝুন ঝুন-ঝুন শব্দ। ঠিক তালে তালে বেজে চলেছে। হঠাৎ একটি প্রবল বিদ্যুৎ

.. ওপর। আলোয় আলো হয়ে গেল
.. স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল চারিদিক।

দুপাশে ঘন শালবনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে একটি সুগঠিত পথ। সেই পথ ধরে দূরে চলছে একটি মানুষ। চলছে নয়—দীনু ডাকহরকরা ডাক নিয়ে ছুটছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে লাঠির ডগায় ঘণ্টা ঘুঙুরের ঝুন-ঝুন শব্দ। আবও দেখা গেল, বাতাসে শালবন দুলছে।

আলো নিভে গেল। ঘনতব হয়ে উঠল অন্ধকার। উচ্চ মেঘগর্জন উঠল।

অন্ধকারের মধ্যে আবাব জ্বলতে লাগল জোনাকি। ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে বাতাসেব মাতামাতি প্রকট হয়ে উঠল। বেজে চলল ঝুন-ঝুন শব্দ।

এইবার বাঁকের মাথায়—যে মুখে দীনু চলেছে তার আগে—বিপরীত দিক থেকে বাঁকের গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাথায় মাথায় ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো দীর্ঘ আলোর ছটা জেগে উঠল। ওপার থেকে কোনো মোটরকার আসছে। তার হেড-লাইট স্পট-লাইটের আলো শিখা বিস্তাব করে এগিয়ে আসছে। মোটর দেখা যাচ্ছে না।

মিনিটখানেক পরেই মোটরখানা বাঁকে মোড় নিয়ে সোজা এগিয়ে এল। দেখা গেল আলো। রাজপথ, দুপাশের জলসিক্ত অরণ্যভূমি চারিপাশের অন্ধকার বেষ্টনীর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীনু ..করাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে ছুটছে। পিছন দিক হতে অদ্ভুত .াগি ..তাকে।

মোটরে আস..ছন ডাক্তারবাবু।

হুডওয়ালা টুরারবডি মোটরটা এগিয়ে দীনুর কাছাকাছি এসে বারেকের জন্য মন্থর হল। এই দুর্যোগের মধ্যে এমন করে কে যায়?

দীনুকে স্পষ্ট দেখা গেল।

পেশী-সবল কালো মানুষটি। মাথায় একটা ছোট টোকা। উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। পরনে মালকোঁচা সেঁটে কাপড় পরা। হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত খালি। কাঁধে একটা লাঠির সঙ্গে ডাকের ব্যাগ বাঁধা রয়েছে, লাঠিব ডগায় বাঁধা দুটি ঘণ্টা, লাঠিতে লাগানো একটি বল্লমের ফলা। হাতে রয়েছে একটি লণ্ঠন।

মোটরের আলো চোখে পড়তেই সে রাস্তার পাশে সরে গিয়ে চলতে শুরু করল ঈষৎ মন্থর গতিতে।

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন - কে?

দীনু চলতে চলতেই উত্তর দিল— ডাকহরকরা, সরকার বাহাদুরের ডাক।

কে, দীনু?

দীনু গাড়ির পিছন দিক থেকে উত্তর দিল– আজ্ঞে হ্যাঁ। কে? ডাক্তারবাবু?

বলতে বলতেই সে অন্ধকারের মধ্যে যেন মিশে গেল।

ডাক্তারবাবু আবার গাড়িখানার গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। গাড়ি চলতে লাগল দুপাশের শালগাছের ভিজে পাতায় হেড-লাইটের তীব্র আলো পড়ে ঝকমক করে উঠল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পড়ল গিয়ে আলো। উর্ধ্বাকাশে খানিকটা দূর পর্যন্ত শূন্যলোকে [illegible] যেন ভাসতে ভাসতে চলল। তার ওপারে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার চিরে দু-একবার মেঘে দূরান্তের বিদ্যুচ্ছটা খেলে গেল। কিছু

দূর গিয়েই আর-একটা বাঁক, সেখানে ডাক্তারের গাড়ি মোড় নিচ্ছে—এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল।

অ্যা—ও,—খবরদার!

ডাক্তার গাড়ির ব্রেক টিপে ধরলেন।

আবার চিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল-- খবরদার। ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক!

ডাক্তার গাড়ি থেকে মুখ বের করে পিছন দিকে তাকালেন।

ওপাশ থেকে দরজা খুলে নেমে পড়ল ড্রাইভার। সে দেখলে পিছনের দিকে তাকিয়ে।

অন্ধকার। কিছুই যেন দেখা যায় না।

মৃদু বিদ্যুৎ চমকাল। সেই মৃদু বিদ্যুতালোকে ড্রাইভার এবং ডাক্তার দেখলেন—দূরে দুটি যুধ্যমান ব্যক্তি। কাউকে চেনা গেল না। একটি লোক—সে নিশ্চিতরূপে দীনু; উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। একজন তার কাছ থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। এ-ছবি একটা চকিতের ছবি। ওই বিদ্যুৎ-চমকের মধ্যে দেখা গেল মাত্র। বিদ্যুৎ-চমক মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার উঠল। না—না—না। না!

ডাক্তার ড্রাইভারকে বললেন—উঠে এসো গাড়িতে। জলদি।

ড্রাইভার উঠে বসল। গাড়ি ঘুরল। হেড-লাইট পড়ল দূরে যুধ্যমান লোক দুটির উপর। তখন আক্রমণকারী লাঠি উদ্যত করেছে। সে পিছন ফিরে আছে আলোর দিকে। দীনু চিৎকার করে উঠল। ডাকাত! ডাকাত! এর পরই লাঠি পড়ল। দীনুর চিৎকার শোনা গেল—আঃ—!

গাড়ি অগ্রসর হল। লোকটি একবার চেষ্টা করল ব্যাগটা টানতে। কিন্তু গাড়ির আঁলো এগিয়ে আসতেই ছেড়ে দিয়ে বনের মধ্য দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল।

দীনু উপুড় হয়ে ডাকের ব্যাগ আঁকড়ে পড়ে আছে। তার মাথার পিছন দিকটা ফেটে গেছে। লণ্ঠনটা গড়াচ্ছে।

ডাক্তার টর্চ ফেলে চারিদিক দেখলেন। ড্রাইভার গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা নিয়ে নামল। ডাক্তারও নামলেন। দীনুকে দেখলেন। হাত দেখলেন। বুকে হাত দিলেন। আঘাতটা দেখলেন। বললেন— এঃ, ঘাটা বড় জোর লেগেছে।

ড্রাইভার বললে— কিন্তু ডাকের ব্যাগটা ছাড়ে নি।

ওকে ফার্স্ট এড দেওয়া দরকার। চারিদিকের বন ও অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখে বললেন— কিন্তু এখানে আর নয়। দলে নিশ্চয় একজন ছিল না। বনের মধ্যে সরে নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। আমাদের দুজন দেখে আবার আসতে পারে। তুমি ওদিকে ধরো। আমি এদিকে।

ধরলেন দুজনে। দীনুকে তুললেন—দীনুর বুকে আঁকড়ে ধরা ডাকের ব্যাগটা উঠতে চাইল। ডাক্তার টেনে ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর গাড়িতে তুললেন।

গাড়ি এসে উঠল সদর হাসপাতালে।

ডাক্তার নেমে ভিতরে গিয়ে সর্বাগ্রে টেবিলে বসে খসখস করে চিঠি লিখে ফেললেন।

ড্রাইভারকে ডাকলেন   শম্ভু !

শম্ভু এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে ব্যাগটা রেখে গেল,

এই চিঠি নিয়ে তুমি এখুনি থানাতে যাও। চিঠি দিয়ে এসো। বোলো আমি দীনুব চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। আঘাতটা জোর বলেই মনে হচ্ছে। ওঁদের এসে ব্যাগটা দেখে নিতে বোলো। পোস্টাপিসে খবর ওঁরাই দেবেন।

শম্ভু চিঠি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার বের হলেন – বিপবীত দিকেব বারান্দায়। তার আগে খুলে ফেললেন কোটটা। আস্তিন গুটিয়ে নিতে নিতে বেবিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাবার সময় দরজা বন্ধ কবলেন চাবি দিয়ে।

বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলেন—রামলাল !

রামলাল এসে দাঁড়াল। ডাক্তাব বললেন—তুমি এই দরজায় পাহারা থাকো। খুব সাবধান !

ওদিকে স্ট্রেচারে দীনুকে বয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা।

ডাক্তার তাদের অনুসবণ করলেন।

ওপাশ থেকে মোটরের শব্দ হল। দেখা গেল শম্ভু মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এদিকে দেখা গেল টেবিলের উপর দীনুকে শোয়ানো হয়েছে।

ডাক্তার হাত ধুয়ে হাত মুছছেন।

তখন ইলেক্ট্রিক হয় নি মফস্বলে। জোর টর্চের আলো ফে হল ক্ষতস্থানে। ক্ষতটা বেশ গভীর। চারিপাশের চুল তখন ক হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখলেন ভালো করে। তারপর হাতে নিঢে সার্জারির যন্ত্র।

সেই মুহূর্তে—বাইরে একটা একটা বজ্রপাতের মতো মেঘগর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বাইবে তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে বর্ষণ দেখা যাচ্ছে। গাছপালায় বাতাসের মাতনেব শব্দ উঠছে। তারই মধ্যে পড়ে আছে নিথর বাবান্দাটা। ডাক্তার দীনুর প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বর্ষণমুখর মেঘ ও অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখের উপর বারেকের জন্য ভেসে উঠল—দীনুর সংগ্রামরত মূর্তি। বিদ্যুতালোকে দেখেছিলেন—একটা লোক লাঠি মারতে উদ্যত হয়েছে দীনুব মাথায়। দীনু উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

একজন নার্স এল।

বললে—ওর জ্ঞান হচ্ছে ডাক্তারবাবু—

--জ্ঞান হচ্ছে? ডাক্তার ঘুরলেন। দ্রুত এসে ঘরে ঢুকলেন।

দীনু তখন চিৎকাব করছে—না—না না!

ডাক্তার এসে পাশে দাঁড়ালেন, বললেন -দীনু, দীনু—ভয় নেই: দীনু!

অ্যাঁ—

—ভয় নেই, তারা পালিয়েছে। তুই হাসপাতালে রয়েছিস। দীনু!

—এ্যাঁ! ডাক্তারবাবু?

--হ্যাঁ, আমি তোর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম---

—আপনি বাঁচালেন আমাকে?

—হ্যাঁ। আমি গাড়ি না ঘোরালে তোকে ওরা মেরে ফেলত।

—আমার ব্যাগ। সরকারী ডাক ?

—আছে। সে নিতে পারে নি। ওঃ, যে জোরে আঁকড়ে ধরে ছিলি— !

দীনু আশ্বাসের সঙ্গে বললে—আঃ !

—তুই এখন ঘুমো। ঘুমের ওষুধ দেবে। এখন আর নয়।

—ডাক্তারবাবু !

—কী ?

—তাকে ধরেছেন ?

—কাকে ?

—সেই—

—ও—সেই ডাকাতকে ? না। ধরব কী করে ? সে পালিয়ে গেল ! গাড়ির আলো ঘুরতেই তোকে ছেড়ে বনের মধ্যে ছুটে চলে গেল। ওদের কি শুধু হাতে ধরা যায় ? ভালো করে দেখতেই পেলাম না। ছায়াবাজীর মতো, ভোজবাজীর মতো মনে হল।

দীনু স্থির দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। আঘাত তার মাথার পিছনে। সে কাত ফিরে শুয়েছিল।

ডাক্তার একজন নার্সকে বললেন—ওকে বেডে নিয়ে যাও। ওষুধটা খাইয়ে দাও।

দীনু ডাকলে—ডাক্তারবাবু !

—কী ?

—আমার কী হবে ডাক্তারবাবু ? পুলিস—(কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল—দরদর ধারায় তার চোখ থেকে জল নেমে এল।)

ডাক্তার হেসে বললেন—কী হবে ? তুই যে কাজ করেছিস

তাতে সরকার তোকে পুরস্কার দেবেন রে। আমি সাক্ষী। ওঃ, তুই বীরের মতো লড়াই করেছিস। বুক দিয়ে মেলব্যাগ যেভাবে তুই ঢেকে ছিলি—এক মানুষ নিজের ছেলেকে ওইভাবে রক্ষা করতে পারে বুক দিয়ে ঢেকে।

দীনু হা-হা করে কেঁদে উঠল।

বাইরে মোটরের শব্দ হল।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

এর পর দেখা গেল—আপিস-ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন এস.পি., পোস্টাল সুপার, সাবইনস্পেক্টর পুলিস, পোস্টাপিসের লোক। ডাক্তারও রয়েছেন।

এস.পি. মেল ব্যাগের শীল পরীক্ষা করে দেখছেন।

পোস্টাল সুপার পাশ থেকে দেখে বললেন—সীল ভাঙে নি। ঠিক আছে।

ডাক্তার বললেন—ডাকাতদের তো ব্যাগ ছুঁতে দেয় নি দীনু। বুক দিয়ে ঢেকে পড়ে ছিল। মাথায় লাঠি পড়ল, তাতেও না। তখনও চিৎকার করছে—সরকার বাহাদুরের ডাক। খবরদার--। আমি গাড়িটা ফেরালাম। হেড লাইটের আলো পড়তেই—

এস.পি. পরীক্ষা শেষ করে ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে ডাক্তারের কথার মাঝখানেই বললেন—আপনার স্টেটমেণ্ট পরে নেব ডাক্তারবাবু। এরপর পোস্টাল সুপারকে বললেন—ব্যাগটা কেটে দেখুন। অন্তত ক্যাশ ব্যাগটা দেখুন, ঠিক আছে কি না! ব্যাগের মধ্যে ক্যাশ স্টেটমেণ্ট নিশ্চয় আছে। কাটুন।

এস.পি. বেরিয়ে এলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল আর-একজন সাবইনস্‌পেক্টর ও কজ৹ কনেস্টবল। কম্পাউণ্ডে ডাক্তারের এবং এস.পি.-র মোটর। এস.পি. সিগারেট ধরালেন। বললেন সাবইনস্‌পেক্টরকে তুমি ডাক্তারের ড্রাইভারকে নিয়ে চলে যাও। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে—সেখানে মোতায়েন থাকো। কোনো কিছু যে নাড়াচাড়া না হয়।

সাবইনস্‌পেক্টর স্যালুট কবে বললে- ইয়েস সার।

—ডাক্তারের ড্রাইভাবকে নিয়ে যাও।

তখন সকাল হয়ে এসেছে। বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে। টিপিটিপি মৃত্থ চার ফোটা বৃষ্টি পড়ছে।

তারই মধ্যে হাসপাতালের আউট হাউস থেকে জমাদার-জমাদারনীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কারও হাতে ঝাঁটা। কারও হাতে বেডপ্যান।

ছুটো উলঙ্গ ছেলে—একটা গর্তের মধ্যে জমা জলে লাফিয়ে লাফিয়ে কাদা-জলে সর্বাঙ্গ চিহ্নিত করছে।

গাছের ডালে কাক বসেছে। ডাকছে। গাছের পাতা থেকে জল পড়ছে নিচে টপটপ করে।

গেটের ধারে একদল লোক জমেছে। বিস্মিত হয়ে দেখছে আর ভাবছে—হাসপাতালে পুলিস কেন?

পুলিস সুপার সিগারেট টানছেন—মধ্যে মধ্যে হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে জুতোর ডগার কাদা ছাড়াচ্ছেন।

পোস্টাল সুপার চামড়ার ক্যাশব্যাগ একখানা ইনসিওর্ড খাম হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন—বোধ হয় এইটের লোভে মিস্টার চৌধুরী, দি অ্যাটেমপ্ট ওয়াজ মেড। হাজার টাকার

ইনসিওর। ব্যাগে টাকা সামান্যই ছিল—আড়াই শো। এভরিথিং ইজ্ ইনট্যাক্ট্।

—ইয়েস। দেখলেন এস.পি.।

ইতিমধ্যে গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হল। এস পি. হাত তুলে রওনা হতে বারণ করলেন।

পোস্টাল সুপার বললেন—হি হ্যাজ্ সেভ্ড্ ইট্। ইয়েস্, হি হ্যাজ্ সেভ্ড ইট্—ওকে আমি

চলে যেতে উদ্যত হলেন। এস.পি. বাধা দিলেন। —নট্ নাউ; ওকে একটু সুস্থ হতে দিন।

আগে চলুন Place of occurrence-টা দেখে আসি।

তাঁরা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি রওনা হয়ে গেল।

হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে স্ট্রেচারে দীনুকে বয়ে নিয়ে হাসপালের বেডে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘুমেব ওষুধ খাওয়ানো হল।

দীনুর চোখের সামনে অন্ধকার রাত্রির বর্ষণসিক্ত অরণ্য ভেসে উঠল।

ঘুমের ওষুধের নেশায় সে-ছবি এঁকেবেঁকে তালগোল পাকিয়ে গেল যেন। চোখ বন্ধ হয়ে এল।

নার্স একজন হাওয়া করছিল।

ওদিকে ঘটনাস্থলে গাড়িখানাকে দেখা গেল।

শম্ভু দেখালে ঘটনাস্থলটি।—ঠিক এইখানটায় স্যার। হ্যাঁ এই-খানটায়। অনেকটা রক্ত পড়েছিল। বোধহয় জলে ধুয়ে গেছে। তারা এই দিক দিয়ে বনে ঢুকে গেল আমাদের লাইট দেখে।

রাস্তা বেয়ে তখনও জল চলে যাচ্ছে।

এস.পি. তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলেন। পড়ে আছে শুধু লণ্ঠনটা। এবং মাথার ভাঙা টোকাটা।

বনের মধ্যে ঢুকলেন। সব চিহ্ন জলে ধুয়ে গেছে।

আবার ঘুরে এলেন ঘটনাস্থলে। লাঠির ডগা দিয়ে একটা জায়গায় জমে থাকা জলের বেরিয়ে যাবার পথ করে দিলেন। বেরিয়ে পড়ল—দুটি হাঁটুর ছাপ, দুটি-হাতের ছাপ।

দীনু যে উপুড় হয়ে ডাকের ব্যাগ আঁকড়ে পড়ে ছিল—এই তো! যে লোকটা লাঠি মেরেছিল, সে ছিল এই দিকে—বনের ধার দিয়ে।

ঝুঁকে পড়লেন এস.পি.। সঙ্গে সঙ্গে S. I.। Postal super-ও ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

S. P., বললেন—হুঁ। বুক দিয়েই জড়িয়ে ধরে রক্ষা করতে চেয়েছিল বটে। লোকটা প্রাণ দিয়ে লড়েছে। yes, He is a brave man—

বিকেল বেলা-মেঘ তখন কেটে এসেছে। আকাশে কাটামেঘ এবং সূর্যালোকের সমারোহে আলোছায়ার খেলা। সেই খেলার ছায়া এসে পড়ছে তখন বিছানায় শায়িত দীনুর মুখের উপর। একদিকে Postal super—। মাথার ধারে টেবিলের উপর ফল সাজিয়ে রেখে Postal Super বললেন—চিনতে পারছ আমাকে?

দীনু সভয়ে বললে—হুজুর। হাত তুলে সেলাম করতে চেষ্টা করলে।

—থাক। তুমি ভালো হয়ে ওঠ! শিগ্‌গির ভালো হয়ে উঠবে—কোনো ভয় নেই।

—হ্যাঁ হুজুর।

—খুব বাহাদুর তুমি! খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ। সরকার তোমার উপর খুব খুশী হয়েছেন। এর জন্যে তুমি রিওয়ার্ড পাবে। আমি লিখব।

দীনুর ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। উত্তর দিতে পারলে না সে। অথবা দিলে না।

সাহেব Postal Super প্রশ্ন করলেন—কত-জন ছিল তারা?

—আজ্ঞে?

—ডাকাতদের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

সভয়ে অস্পষ্ট ভাবে বললে, ডা-কা-ত-রা?

—হ্যাঁ, কত জন ছিল তারা? কাউকে চিনতে পেরেছিলে? অন্ধকারের মধ্যে হলেও খুব কাছে এসেছিল তো তারা?

বিহ্বলের মতো দীনু কাঁদতে লাগল।

—কাঁদছ কেন? কেঁদো না।

—আমাকে মেরে ফেলাইতো হুজুর—মরে যেতাম আমি—

—না—না—না। তুমি শিগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি ভাবো, ভেবে দেখো,—যদি কারুর মতো মনে হয়—মনে করো। আমি আবার আসব। এ ফলগুলি তুমি খেয়ো। আবার আসব আমি।

সাহেব উঠলেন।

দীনু স্থির দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ শান্তভাবেই বলে উঠল—হুজুর!

সায়েব ফিরলেন।—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, হুজুর। শান্ত ভাবেই সে জানালার দিকে চেয়ে কথাগুলি বললে।

—বলো, কি বলবে বলো!

এবার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। অতিকষ্টে বললে—হুজুর!

Postal Super প্রতীক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত—তারপর বললেন—বলো, কি ইচ্ছে হচ্ছে বলো?

আত্মসংবরণ করে দীনু বললে—হুজুর আমার ছেলে—,

চোখ দিয়ে জল গড়াল। সূর্যালোক প্রখর দীপ্তিতে মুখের উপর পড়ল। দীনু মুখ ফেরালে।

সুপার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জানালার ঘসা কাচের দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন তোমার ছেলেকে দেখতে চাও?

অন্ধকার ছায়ার মধ্যে দীনু বললে—হ্যাঁ হুজুর। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

—বেশ, তার জন্যে কী? আজই তোমার পোস্টাপিসের মাস্টার বাবুর কাছে তার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দীনুর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

সাহেব কাছে এলেন। হেসে বললেন—কাঁদছ কেন?

দীনু বললে—হুজুর!

সাহেব হাতের ফাইলখানা দেখিয়ে বললেন—এতে পড়ছিলাম; —এটা তোমার ফাইল, তোমার চাকরির গোড়া থেকে এ পর্যন্ত সব কথা লেখা আছে। পড়ছিলাম—তুমি ভয়ানক সাহসী লোক। মস্ত লাঠিয়াল। ভূত প্রেত ডাকাত কাউকে ভয় কর না। নবগ্রামে পোস্টাপিস হবার পর যখন পথে সুঁদীপুরের বটতলায় ভূতের ভয়ে...

ঠ্যাঙাড়ের ভয়ে রানার পাওয়া যায় নি—তখন ওখানকার জমিদার-বাবুরা তোমাকে দিয়েছিলেন। আজ পনেরো বছর তুমি ডাকহরকরার কাজ করছ, জলে ঝড়ে—কোনো কিছুতে একদিন তোমার পাঁচমিনিট দেরি হয় নি। আজ তুমি ডাকাতেব হাত থেকে সরকারী ডাক বাঁচিয়েছ—আঘাত পেয়েছ কিন্তু সে তো খুব বেশী নয়। ক-দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। তুমি কাঁদছ কেন?

দীনু স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—

মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল তার অতীত দিনেব কথা:

পনেরো বছর আগে—

নবগ্রামের খড়োচাল মাটির ঘব ব্র্যাঞ্চ পোস্টাপিস। কাঠের খুঁটি দেওয়া মেটে বারান্দা। সেই বারান্দায় বসে আছেন গ্রামের চার পাঁচ জন ভদ্রলোক, পোস্টাল ইন্সপেক্টর, দাঁড়িয়ে আছেন পোস্টমাস্টার, ওভারসিয়ার, পিওন এবং বারান্দার নিচে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পনেরো বছর কম বয়সের দীনু। দেওয়ালে একটা নোটিশবোর্ড একটা নোটিশের মাথায় লেখা—1928—March.

প্রবীণ দাশরথি বাবু- সম্ভ্রান্ত সৌম্য চেহারা—তিনি বললেন—

এ কাজ তোকে নিতে হবে দীনু। গ্রামের মান রাখতে হবে। সুঁদীপুরের বটতলার ভয়ে রাত্রে ডাক যায় না—তার জন্যে ডাক যেতে একদিন দেরি হয়, পেতে একদিন দেরি হয়—এতে গ্রামের অসুবিধে সঙ্গে সঙ্গে দুর্নাম। আমি জানি তুই পারিস।

দীনুর মনশ্চক্ষের সামনে বারেকের জন্য অন্ধকার রাত্রির সুঁদীপুরের বটতলা এবং অরণ্যঘন পথখানি ভেসে উঠল। বটগাছের ডাল দুলতে থাকে।

এই দৃশ্যের মধ্যেই দাশরথিবাবুর কথা শোনা গেল। তিনি বলেই চলেছিলেন—ও পারবে ইনস্‌পেক্টর বাবু। এই তো সেদিন আমার বড়ছেলেকে তার করবার জন্য রাত্রি আটটার সময় পাঠালাম বোলপুরে এখান থেকে, রাত্রি তিনটে নাই বাজতে ফিরে এল—তার করে তার রসিদ নিয়ে। ও আমার কৃষাণের ছেলে। লাঠিয়াল হয়েছে, কিন্তু সৎলোক—দাঙ্গা করতে পারে না। ধর্মকে ভয় করে—চোর ডাকাতদের ছায়া মাড়ায় না। যমকেও ভয় করে না। পাউড়েও খুব।

পথের দৃশ্য মিলিয়ে গেল—দীনু বাস্তবে ফিরে এল।

ইনস্‌পেক্টর প্রশ্ন করলেন—পাউড়েও খুব? তার মানে?

—ও। পাউড়ে মানে—পা যার উড়ে চলে ইনস্‌পেক্টর বাবু। মানে খুব জোরে হাঁটতে পারে। আমার ছেলে একবার মহলে ছিল—এখান থেকে পাঁচ কোশ রাস্তা—জরুরী খবর নিয়ে যেতে হবে—আবার ফিরতে হবে সঙ্গে সঙ্গে; মানে এক নাগাড় দশকোশ বিশ মাইল—তা দীনু চার ঘণ্টায় গিয়ে ফিরে এসেছিল।

—মানে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল! বাঃ! দীনু মাথা নিচু করে বসে মাটির উপর খোলামকুচি দিয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময় পোস্টমাস্টারেব মেয়ে আট দশ বছর বয়স—সে ঘরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে বললে—বাবা! চা তৈরী হয়েছে। আনব?

মাস্টার ঘুরে তাকিয়ে বললেন—আনো।

মেয়েটি চলে গেল।

মাস্টার পিওনকে বললেন—ফেলবে হয়তো। তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

পিওন ভিতরে চা আনতে চলে গেল।

দাশরথিবাবু ইনস্‌পেক্টরের কথার উত্তরে বললেন—ওকেই এ্যাপয়েন্ট করুন; ওর জন্যে দায়ী থাকতে হলে আমি থাকতে রাজী আছি। ডাকাত ঠ্যাঙাড়ে সেকালে ছিল একালে নাই। ভয়টাই আছে। কিরে দীনে, ডাকাতের ভয় আছে না কি? মানে, পথে রাহাজানির?

দীনু নত মুখেই একটু হেসে বললে—আজ্ঞে না। সি-সব আর কোথা পাবেন? সে কালও নাই সে মানুষও নাই। তবে ওই তু-চার জনা আছে একলা-দোকলা তুব্যল ভালোমানুষ পেলে—চড়-চাপড়টা মেরে ভয় দেখিয়ে পুটলী-মুটলী কেড়ে-কুড়ে নিয়ে পালায়। তাও দিনে-তুপুরে। রেতে-বিরেতে নয়। সি-সব দানা দত্যির মতো মানুষগুলান ফৌত হয়ে গিয়েছে। একেবারে নিববংশ। পাপ করে কি কেউ বাঁচে? বাঁচে না!

—তা হলে তুমি পারবে বলছ? —ইনস্‌পেক্টর বললেন।

এরই মধ্যে পিওন কাঁসার থালার উপর বসিয়ে চায়ের কাপ নিয়ে এল। পোস্টমাস্টার সেগুলি এগিয়ে দিলেন।

দীনু উত্তর দিলে—হুজুরদের হুকুম হলে পারব না ক্যানে? পারব।

—ভূত প্রেতের ভয়?

ফিক করে হেসে দীনু বললে—ভূত কোথা হুজুর? উ-সব নষ্ট তুষ্ট মেয়ে পুরুষের কাণ্ড!

—ভূত বিশ্বাস কর না তুমি?

—রাম রাম বলতে বলতে চলে যাব হুজুর।

—বুঝে দেখো। সন্ধ্যের সময় এখান থেকে রওনা হয়ে বোলপুর পৌঁছুতে হবে এগারোটার মধ্যে। আবার সেখান থেকে বেরুতে হবে তিনটের পর, এখানে পৌঁছুতে হবে ছটার মধ্যে। পারবে? ইতিমধ্যে চা খেয়ে শেষ করে কাপ নামিয়ে দিলেন। এবং সিগারেট কেস বের করে দাশরথিবাবুর সামনে ধরলেন।—নিন।

দীনু বললে—তা পারব বই কি। এই তো বোলপুর! হামেশাই যেছি আর আসছি!

সিগারেট ধরিয়ে ইনস্‌পেক্টর বললেন— সরকার বাহাদুরের ডাক। টাকা পয়সা ইনসিওর, রেজিস্ট্রি। কত লোকের কত চিঠি। জল হোক ঝড় হোক—তোমাকে ডাক নিয়ে পৌঁছুতে হবে।

—তা ঠিক পঁহুচে দোব হুজুর। ঠিক দোব।

—হ্যাঁ! পৌঁছে দিতে হবে। পথে কোথাও একমিনিট দাঁড়াবে না, বসবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতে থামবে না। তুমি নিয়ে যাবে সরকার বাহাদুরের ডাক।

এবার একটু আতঙ্কিত হল দীনু কথাগুলির প্রভাবে। বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাশরথিবাবু বললেন—চোর আসুক ডাকাত আসুক—জান দিয়ে রুখবি। হ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—বিপদের সময় মনে থাকবে তো এ-কথা? তখন ভয়ে ভুলে যাবে না তো? ডাক ফেলে পালাবে না তো?

দীনু হাত জোড় করে বললে—সব বেচে সবাই খায় হুজুর, ধর্ম বেচে কেউ খায় না, খেতে নাই হুজুর—আমি তা খাব না।

ইনস্‌পেক্টর ওভারসিয়র এবং পোস্ট মাস্টারকে বললেন—তা হলে ওকেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট্‌ দাও। আর রুট বদলে—এই পথ দিয়ে ডাক যাক, এবং সন্ধ্যের পর ডাক যাবে আবার রাত্রেই রওনা হয়ে ডাক এসে ভোরে পৌঁছুবে। (দীনুর প্রতি) তুমি মাইনে পাবে মাসে পনেরো টাকা। ওভারসিয়ার বাবুর কাছে ফরমে তোমার টিপ ছাপ দাও। পেটী নাও কোট নাও—কেমন? মনে থাকে যেন সরকার বাহাদুরের ডাক বইবার ভার নিলে তুমি।

দীনু সরকারী কোর্তা পরে কোমরে পেটি মাথায় পাগড়ি বেঁধে কাঁধে ঘুঙুর ঘণ্টা এবং বল্লাম পরানো বাঁশের লাঠিটি নিয়ে অহঙ্কৃত ভাবেই নবগ্রামের অল্প কয়েকখানা ছোট দোকানওয়ালা বাজারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরল।

পথে একটা দোকানের সামনে বাউল হরিদাস আলখাল্লা পরে একতারা বাজিয়ে গান করছিল—দীনু গান শুনে খুশী হল। বাবাজী একতারা হাতে সমবেত জনতার কাছে পয়সা চেয়ে ফিরতে ফিরতে দীনুর কাছে এসে দাঁড়াল। পাগড়ি কোর্তা পরা দীনুকে সে দীনু বলে চিনতেই পারে নি। চিনতে পেরে সবিস্ময়ে বললে—আঁ! দীনু?

দীনু একটি পয়সা বাবাজীর ভিক্ষা পাত্রে ফেলে দিয়ে বললে—হ্যাঁ গো বাবাজী। চিনতে পারছ না নাকি? মুখের দিকে চেয়ে থেকে বাবাজী বললে—তা লারছি দীনু। এই পোশাক, পেটী কোর্তা পাগড়ি এ্যাঁ! তার উপর নগদ একটা পয়সা দিলি—ওরে বানাস্‌ রে!

চারিপাশের জনতার মধ্যে থেকে কেউ বললে—ও বাবারে। তাই তো বটে! দীনেই তো বটে! আমি বলি কে সরকারী চাপরাশী টাপরাশী।

একজন বললে—বন থেকে বেরুল টিয়ে লালগামছা মাথায় দিয়ে!

দীনু ওদেব কথা গ্রাহ্য না করেই বললে—চাকুরী পেলাম যে বাবাজী।

—চাকরি

–হ্যাঁ গো; ডেকে দিলে।

—ডেকে দিলে?

—খাস সরকারী চাকরি। পোস্টপিসেব ডাকহরকরা। মাসে পনেরো টাকা মাইনে। তার ওপর এই কোর্তা পেটী পাগড়ি!

বাবাজী বললে—বলিহারি বলিহারি! পনেরো টাকা মাইনে! তার উপর কোর্তা পেটী পাগুড়ী!

বলেই গান ধরে দিল—আহা, লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে

রাজা হলে মথুরাতে—
বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে বঁধু হলে দণ্ডদাতা
কলঙ্কিনী রাধায় দণ্ড দিলে মান থাকে কোথা?
লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে—
এখন আমি নালিশ করি—
মাখন চুরি বসন চুরি—
শেষে মন অপহরি—ফেরারী চোর গেল কোথা?
বেঁধে এনে বিচার কর—শুনব নাকো ছুতোনাতা।
বঁধু তুমি রাজা হয়ে কেন হলে হায় বিধাতা—

গান শেষ করে হরিদাস তার চিবুকে হাত দিয়ে বললে—তাই জন্যে পয়সা দিলি আমাকে! হরিবোল হরিবোল। ভালো হবে রে তোর ভালো হবে।

একজন বললে—তা হলে এতদিনে নোটন চৌকিদারের কাছে হেঁট মাথাটা তোর উঠল!

দীনু বললে—উঠল মানে? ওর চেয়ে উঁচু হল গো! ও তো চৌকিদার; মাস্টারবাবু বললে—ওর তো ছোট গবরমেণ্টাবের চাকরি। আমার চাকরি বড় গবরমেণ্টারের; ভারত গবরমেণ্টারের গো! হাঁ! তবে হ্যাঁ;—চাকরি ওর সুখের বটে। ঘরে শুয়ে শুয়ে জানলা খুলে এ—হৈ—এ—হৈ বলে হাঁক মেরি চাকরি করা চলবে না। আমার চাকরি বুয়েছেন--সরকার বাহাদুরের ডাক—জল হোক—ঝড় হোক—বাজ পড়ুক—ঠিক সময়ে ডাক পৌছে দিতে হবে। আচ্ছা—চলি বাবাজী; আবার উদিকে টিকিস কেটে দেবে। মদের দোকানে গো!

ওদিকে দিনুর বাড়িতে—দীনুর স্ত্রী সদু অর্থাৎ সৌদামিনী দাওয়ায় বসে ভাত রাঁধছে। সেখানে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। মাটির হাঁড়ি মাটির কলসী মাটির ভাঁড় খুরি নিয়ে সংসার। কেবল একটা ঘটি চকচক করছে। চাঁদের আলোয় সেদিন ঝলমলে জ্যোৎস্না। উঠানটার একপাশে একখানা ছোট শাকের ক্ষেত। চারিপাশে বেড়া দেওয়া। একপাশে দুটি বলদ এবং দুটি গাই বাঁধা। এরা বসে রোমন্থন করছে।

একটু দূরে কোথাও থেকে শব্দ আসছে ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠকা ঠক্।

একটু দূরেই একটা খোলা জায়গায় ছেলে আট ন বছরের নিতাই এবং ক-জন পাড়ার ছেলে বাখারীর লাঠি নিয়ে লাঠি খেলছে তারই শব্দ ওগুলি।

দীনুর স্ত্রী রান্না ছেড়ে দাওয়ার প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

চালের বাতা ধরে একটু ঝুঁকে ডাকলে—চিৎকার করেই ডাকলে—নেতা-ই। নে-তাই রে! অরে—অ নে— তা—ই।

উত্তরে এল শুধু ঠক্—ঠক্ শব্দ।

দীনুর স্ত্রী নামল উঠানে। আবার ডাকলে—নে—তা—ই!

উত্তর এল। ওই অবিশ্রান্ত ঠক্ ঠক্ শব্দের মধ্যেই উত্তর এল—কী!

—বলি করছিস কী? শুনে যা!

—লারব এখন। সময় নাই!

—সময় নাই লয়, শুনে যা!

—আমি যাব না—! এ্যাই ও! (ধমকটা দিল তার খেলোয়াড়কে)—

—তবে রে হারামজাদা—বজ্জাত—

বলতে বলতে সে এগিয়ে এল—এবার লাঠি খেলোয়াড়দের দেখা গেল। নগ্নকায় খাটো কাপড় মালকোছা মারা ছেলে কয়েকজন বেশ দক্ষতার সঙ্গে লাঠি খেলছে।

অ্যাই—ও। অ্যাই ও।

হ্যাই। হ্যাই। হ্যাই!

সঙ্গে সঙ্গে ঠক্ ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠকাঠক্ লাঠিতে লাঠিতে সংঘর্ষ চলছে।

সতু বউ এসে দাঁড়াল এবং ডাকলে—নেতাই। খেলা রাখ।

নেতাই উত্তর না দিয়ে খেলেই গেল—এবং প্রতিপক্ষের লাঠিতে ঘা মারার সঙ্গে হাঁক মেরে গেল—

হ্যাই লে। হ্যাই লে। হ্যাই হ্যাই হ্যাই। হ্যাই ও! হ্যাই—

প্রতিপক্ষ পিছন হঠছিল।

সতু কঠোর কণ্ঠে ডাকলে—নেতাই! ওরে হারামজাদা—

—ক্যানে রে হারামজাদী। হ্যাই ও। বলে—ঘুরে এসে নিজের কোটে দাঁড়াল।

—লাঠি রাখ। শোন!

—না। না। না। ভাত এখন খাব না। যা!

—মেরে তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করব বলছি। তোর বাবা এখনও আসে নাই—সেই যেয়েছে। বাবুদের লোক ডেকে নিয়ে যেয়েছে। দেখে আয় একবার।

—যেয়েচে আসবে। আমি এখন যাব না, যা।

—ওরে মুখপোড়া, চাপরাশী বলে গেল সরকারী হাকিম ডেকেছে। সরকারী হাকিম ডেকেছে, এতক্ষণ হয়ে গেল—দেখে আয়—

—পারব না আমি, সি মরুক গো!

—কি বললি? মরুক গো? তু মর।

—তু মর! তু মর! তু মর!

এর প্রতিক্রিয়ায় অন্য ছেলেগুলি থেমে গেল। একজন বললে—য্যা ক্যানে নেতাই। মা ডাকছে। কাল খেলব আবার।

নেতাই ক্রুদ্ধ ভাবে একমুহূর্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে

উল্টোমুখে হাঁটতে লাগল। সত্থ মনে করলে সে তার বাপের খোঁজে চলেছে। সে বললে—বাবুদের বাড়ি দেখবি। সেখানে না-পাস তো একবার মাতালশালে যাস—

নেতাই মুখ ভেঙিয়ে দিল—অ্যাঁই—অ্যাঁই—অ্যাঁই

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ওদেব বাড়ির দিক থেকে কারুর ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল—এ সদ্দ্ বহু! দীনবন্ধুকে পরিবার! এ—

সত্থ চমকে উঠল। নিতাই থমকে দাঁড়াল।

আবার হাঁক এল—এ—নেটাইচরনা—দীনাকে লড়কা—

সত্থ ছেলেব দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—কে রে? ও নেতাই, পশ্চিমার লোকেব মতো কে ডাকছে রে? পুলিস-মুলিস না ক্যারে?

নিতাই এবার ফিরল। এবং হাকলে—কে বটে হ্যায়?

আসলে ডাকছিল দীনু। তার একটু মদের নেশা লেগেছে। বাড়ির উঠানের ধারে দাঁড়িয়ে ওই পাগড়ি পেটী কোর্তার সুযোগ নিয়ে হাতের বল্লম ও ঘণ্টাওয়ালা লাঠিটা ঠুকে কণ্ঠস্বর বিকৃত করে স্ত্রী পুত্রকে সানন্দ কৌতুক দেখাচ্ছে।—

—এ সদ্দ্ বহু। এ দীনুকে লড়কা। এ হারামজাদে!

ওপাশে উঠানের প্রান্তে দাঁড়াল এসে মা ও ছেলে।

নেতাই প্রশ্ন করলে--তুমি কে হ্যায়?

দীনু উত্তর দিলে—সরকারী লোক হ্যায়। গবরমেণ্টারকে লোক! চলো। তুম লোক কো যানে হোগা।

সত্থ চুপিচুপি ছেলেকে বললে—বল, বাবা বাড়িতে থাকতা নেই। বাবা আসে'গা তখন আও!

নেতাই সে-কথা বলবার আগেই দীন্নু বললে—নেহি, নেহি! সরকারী হুকুম হ্যায়, তুম লোক—মা বেটাকে ডাকঘরকে থলিয়াকে ভিতর বন্ধ্যো করকে চালান করে গা।

—চালান করে গা? কাহে ক্যানে?

—তোমরা স্বামীকে চাকরি হুয়া—হ্যাঁ—ডাকহরকরাকে চাকরি—। এর পর সে হা-হা করে হেসে ফেললে।

এবার ছেলেটা ছুটে এসে বাপের পাগড়ির লেজটা ধরে টেনে খুলে ফেললে—এবং চিৎকার করে উঠল—ওটে মা-টে—বাবা-বাবা। বাবা পাগড়ি বেঁধে চলে এয়েচে!

দীন্নুর হাসি বেড়ে গেল। ছেলেকে সে কোলে তুলে নিলে। হাসতেই লাগল—হা-হা-হা—হা—হা—হা!

এবার সত্নু এগিয়ে এল—গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললে—অ মা-গো! ই সব কী গো? এ্যাঁ?

—এই সব? কোর্তা?

—হ্যাঁ। তা পারতে ইটো কী? কোমরে?

—পেটী। পেতলের ইটো দেখেছ? খোদাই করা দেখেছ? এই দেখ।

এবার সে স্ত্রীর হাত ধরে দাওয়ায় প্রায় টেনে এনে কেরোসিনের ডিবেটা পেটীর সামনে ধরলে।

—দেখেছ? নেকা রয়েছে খোদাই করে?

—হ্যাঁ গো। কী নেকা রয়েছে গো?

—ডা-ক-হ-র-ক-রা। গবরমেণ্টারের লোক!

—ই তুমি পেলে কোথা?

—হুঁ—হুঁ! যথাসাধ্য হরিদাস বাউলের গান নকল করে গাইলে—আহা! লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে—আজ্ঞা হলাম মথুরাতে—

বাঁশী ছেড়ে দণ্ড হাতে –

যা-ছাই ভুলে গেলাম। এ্যাই এ্যাই—ই ছোঁড়ার কাজ দেখ দি-ই নি। পাগুড়ীটা নিয়ে কি করে দেখ! ধুলো লাগছে। ধুলো লাগছে।

নিতাই বাপের পাগড়িটা নিয়ে মাথায় বাঁধছিল। একটা পাশ লুটাচ্ছিল ধুলায়। সেই দেখে ছুটে গেল দীনু এবং পাগড়িটা কেড়ে নিল।

—ওরে বাবা! এ গবরমেণ্টারের জিনিস। সব্বনাশ সব্বনাশ। এখুনি জরিমানা হবে আমার আর তোকে ধরে নিয়ে যাবে। সব্বনাশ!

—না। ওমুনি পাগুড়ি আমি লোব। না!

—কিনে দোব। ছোট মতন কিনে দোব। এ ছুতে নাই।

—এখুনি। এখুনি লোব আমি। না!

—এই দেখ। ক্ষ্যাপা ছেলের ক্ষ্যাপামি দেখ। আজ কোথা পাব। মাইনে পাই কিনে দোব। শোন শোন, সরকার বাহাত্নরের ডাকঘরের নেস্‌পেক্টর সাহেব নিজে ডেকে আমাকে ডাকহরকরার চাকরি দিলে। মাসে পনেরো টাকা মাইনে। শুধু রেতে ডাক নিয়ে যাব বোলপুর। আবার রেতেরেতেই ডাক নিয়ে ফিরে চলে আসব। বুঝলি! দিনে একবেলা খাটব একবেলা ঘুমোব। বুঝলি! এই পেথম মাসের মাইনে পেলেই তোকে একটা কামিজ কিনে দোব—আর লাল শালুর একটা পাগড়ি কিনে দোব। আর সত্নকে—

—না। আজই দে কিনে। আজই লোব আমি—। নইলে ওইটো দে।' দে-দে!

পাগড়ি ধরে টানতে লাগল।

—নেতাই!

—না-না-না।

—না লয় শোন। পাগুড়ি বাঁধলে ডাক বইতে হবে। এই দেখ এমনি করে। নিজে পাগড়িটা বাঁধলে—বল্লমটা ঘাড়ে করলে এবং উঠানে ডাকহরকরার পথ চলার অভিনয় করে ছুটতে লাগল—ঘণ্টা বাজতে লাগল। দীনু বলে গেল—সরকার বাহাদুরের ডাক। পাঁচ মিনিট দেরি করলে ডাকগাড়ি ছেড়ে দেবে। জল হোক ঝড় হোক বাজ পড়ুক থামবার উপায় নাই—হ্যাঁ। অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে শুঁদীপুরের বটতলার নিচে দিয়ে—

অন্ধকার রাত্রে বনপথের ভিতর দিয়ে ঝুন্ ঝুন্—ঝুন্ ঝুন্ ঘণ্টা বেজে চলেছে। দীনু ছুটছে ডাক নিয়ে। তাকে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার দিয়ে গড়া মানুষের মতো মনে হচ্ছে। সামনে শুঁদীপুরের বটতলা—

বটগাছের অন্ধকার তলায় মধ্যে মধ্যে ফিস্‌ফিস্ শব্দ উঠছে। ডাল দুলছে। কেউ যেন দোলাচ্ছে।

দীনু বটগাছের তলায় আসতেই ঝরঝর শব্দে বালি কাঁকড় ঝরে পড়ল। দীনু চলতে চলতেই হেসে উঠল।

খোনা স্বরে এবার প্রশ্ন হল—কেঁ—রেঁ—?

দীনু হেঁকে বললে—সরকার বাহাদুরের ডাক। আমি ডাকহরকরা নবগেরামের দীনু হে রসের নাগর!

—এঁ পঁথ দিঁয়ে হাঁটিস না। মঁরবি। সাঁবধান কঁরে দিঁলাম !

—আজকে রেতেই আবার ফিরব। দিব্যি রইল গাছ থেকে নেমে পথে দাঁড়িয়ে থাকিস। পারলে ঘাড়টা মুচুড়ে দিস !

চলতে লাগল দিনু। সুঁদীপুর পিছনে পড়ে রইল।

অনেকটা এগিয়ে বন শেষ হল। খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে শড়ক চলছে। পাশে গ্রাম। কুকুর চিৎকার করে উঠল।

দীনু গ্রাহ্য করলে না—চলল।

এরপর চলছে একসারি গাড়ি, মাল নিয়ে চলেছে। গাড়ির চাকায় ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ উঠছে। তার পাশ দিয়ে তাদের অতিক্রম করে সে চলল।

আরও খানিকটা এসে—শেয়াল ডেকে উঠল।

দীনু চলল।

খানিকটা পরেই বোলপুরের আলো দেখা গেল।

একটা ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল।

দীনু আরো জোরে ছুটল।

শহরের মুখে ঢুকল দীনু।

এরপর সে এসে পোস্টাপিসের দাওয়ায় উঠল।

বললে—হুজুর ! মাস্টার বাবু !

ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে।

পিওনেরা চিঠিতে ঝপা-ঝপ ছাপ মেরে চলেছে। শব্দ উঠছে।

,টেলিগ্রাফের যন্ত্রে টকটক শব্দ উঠছে।

দীনুর কথার উত্তরে ভিতর থেকে শব্দ এল—কে ?

—নবগেগ্রামের ডাকহরকরা হুজুর !

—নবগ্রামের ডাক ?

—ঘরের মধ্যে পোস্টমাস্টার ঘড়ির দিকে তাকালেন। আপন মনেই বললেন, নটা বাজে নি এখনও ! কটায় ডাক ছেড়েছিল ? প্রশ্ন যেন নিজেকেই করলেন।

পিওন একজন দরজার গায়ে লাগান ছোট দরজাটা খুলে—মুখ বাড়িয়ে বললে—আন, ভিতরে আন !

দীনু ডাকব্যাগ ভিতরে এনে নামিয়ে সভয়ে বললে—ডাকগাড়ি চলে যেয়েছে হুজুর ?

পিওন বললে—ডাকগাড়ি চলে যেয়েছে ? এখনও তিন ঘণ্টা দেরি। বারোটায় ডাকগাড়ি।

—ওঃ ! রেলগাড়ির বাঁশির ফুঁকুনি শুনে যে ভয় আমার লেগেছিল ! ওঃ। একটু জল পাব হুজুর ?

মাস্টার সবিস্ময়ে দীনুকে দেখছিলেন। ওদিকে একজন পিওন ছাপ মেরেই চলেছে।

মাস্টার টেলিগ্রাফে হাত দিয়ে কল চালাতে চালাতে বললেন—ঘেমে তুই নেয়ে উঠেছিস ! সারাপথ বুঝি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছিস ? যা, ওই দিকে দেখ কুয়ো আছে, বালতি আছে। তুলে নিয়ে খেগে যা। কিন্তু একটু থেমে খাস বাবা। আর এত দৌড়ে আসিস নে।

দীনু চলে গেল।

পিওন বললে—নতুন লোক। পুরনো হোক দাঁড়ান তখন ঘুমুতে ঘুমুতে আসবে। নবগ্রাম থেকে রওনা হয়েই ঘুম শুরু হবে—এখানে এসে ঘুম ভাঙবে।

মাস্টার টেলিগ্রাফ শেষ করে কলে একটা সমাপ্তির টোকা মেরে

বিড়ি ধরালেন। বললেন—তা মিছে বল নি। ওই গোবিন্দ, মহেশ্বরা এদের সঙ্গে মিশবে তো, তিন দিনে চলতে চলতে ঘুমনো তালিম করে দেবে!

আবার কলটা টক টক করে উঠল।

মাস্টার চটে গিয়ে বললেন—দূরো ছাই! আবার টকর টকর—। টকর টকরের নিকুচি করেচে। জ্বালালে রে বাবা! বলিয়াই একটা বই কলটার উপর চাপা দিলেন।

বাইরে আবার ডাকহরকরার ঘণ্টার শব্দ হল।

একজন ডাকহরকরা ডাক নামালে বাইরে।

দীনু তখন দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছে।

পিওন বেরিয়ে এসে বললে—কে রে? কে এলি?

নতুন হরকরা বললে—আমি গোঃ।

—মহেশ্বরা?

—হ্যাঁ গো!

—রতনপুর থেকে তোর আসতে এত দেরি? ওই দেখ নবগ্রাম থেকে তোর আগে এসেছে—তোর চেয়ে ছুকোশ রাস্তা বেশী! বলছি আমি ওভারসিয়ারকে দাঁড়া।

—মানুষ না ঘোঁড়া গো আমরা? ভারি বললেন যা হোক! আসছিই তো। পায়ের হাঁটনেই তো হেঁটে আসছি, না কী!

পিওন বললে—ও বুঝি পায়ে হাঁটনে হাঁটে না? বদমাশ কোথাকার। পথে ক-বার বসেছিলি? ক-বার তামাক খেয়েছিস? ক-জনার সঙ্গে গল্প করেছিস?

মহেশ্বরা ডাক ব্যাগ ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—ওই কথা তোমাদের। লাও লাও ডাক লাও। ভিতরে ঢুকল সে।

পিওন দীনুকে বললে--তুমি ওইখানে শুয়ে পড়ছে। ঘুমিয়ে নাও। এখন সেই তিনটে পর্যন্ত ছুটি!

এদিকে সূর্যোদয় হচ্ছে। দূবে কোথাও শুধু করতাল বাজিয়ে টহলদাব গেয়ে যাচ্ছে—বাই জাগো বাই জাগো বলে শুকসারী ডাকে। বাই জাগো—মিলিয়ে গেল ওই এক কলিব গান। তখন সত্থ বউ ছিটে বেড়াব দেওয়াল খড়েব চাল গোয়াল ঘব থেকে গোরু বের করে বাইবে বাঁধছে। মার্চ মাস—ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্র পড়ছে। পাশে একটা পলাশ গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। নিম গাছে কচি পাতা দেখা দিয়েছে। দাওয়াব উপব বসে সন্থ ঘুমভাঙা নেতাই বাপের হুকোয় তামাক খাচ্ছে।

সত্থ গোয়াল ঘর থেকে বেব হতে গিয়ে মাথায় ঠোক্কর লাগিয়ে উহু-হু বলে বসে পড়ল। নেতাই তাকিয়ে দেখে বললে—এতুটুকু দুয়োরে এই মাথা করে বেরুচ্ছে হারামজাদী। আচ্ছা হয়েছে। অক্তপাত হয়েছে?

সত্থ ছেলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—মারব গিয়ে মুখে থাবড়া! তারপর উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে বললে—এই ঘর ভেঙে আগে গোয়াল করব তবে আমার নাম সত্থ!

—মুড়ি দেটে। মুড়ি দে!

সত্থ উঠান অতিক্রম করে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘরে ঢুকল মুড়ি আনতে।

নেতাই ব্যর্থ অনুকরণে গাইতে চেষ্টা করলে—আই জাগো-আই জাগো—শুক-সারী ডা-কে।

সদু মুড়ি এনে নেতাইয়ের পাতা গামছাখানায় ঢেলে দিয়ে বললে, আই—মুড়ি খেতে খেতে একবার যা। দেখে আয়।

—কী?

—তোর বাবাকে। ডাকঘরে যা।

নেতাই মুড়িসুদ্ধ গামছাখানা নিয়ে উঠে চলতে চলতে বললে—তোর পরান উথুলুছে তো তু যা। আমি চললাম মৌফুল কুড়ুতে। বেলা হলে একটো পাব না।

—নেতাই।

নেতাই গান ধবলে—ও সায়েব আস্তা বানালে—

ছ-মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে—

ও সায়েব—।

ওদিকে তখন নবগ্রামের পোস্টাপিসে ডাক কাটা হয়েছে।

দীনু বসে তামাক সাজছে একদিকে। পিওন চিঠি পড়ে ভাগ করে রাখছে।

পোস্ট মাস্টার ক্যাশব্যাগ এবং রেজেস্ট্রি ব্যাগ মিল করছেন।—ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন গ্রামের পত্র-প্রত্যাশীরা।

দীনু বেরিয়ে এসে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কলকে ধরে তামাক টানতে লাগল।

বিলিতী মাস্টার বাইরে থেকে বললে—দেখি দেখি ও প্যাকেটটা। ওটা আমার না হে রামলাল ?

অন্য একজন বললে—কী হে, ওটা কী হে বিলিতী মাস্টার ?

—হরস্কোপ, মানে কুষ্টি। জার্মানি থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—জন্মের সন-তারিখ পাঠালে কুষ্টি করে পাঠাবে। তাই করে পাঠিয়েছে।

পিওনেব কাছ থেকে কোষ্ঠীটি নিলে বিলিতী মাস্টার। এবং খুললে। কয়েকজন ঝুঁকে দেখতে গেল। মাস্টার বললে—না। কুষ্টি দেখবে কী ? না। গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

একজন বললে—বিলিতি মাস্টাব! আচ্ছা নাম হয়েছে সরকারের। বিলিতি তালেই আছে।

পিওন দরজা থেকে মুখ বের করে বললে—থানা, থানার ডাক।

একজন কনেস্টবল ভিড়ের পিছন থেকে বললে—হটিয়ে সব, হটিয়ে।

ভিড় সরিয়ে এসে সে ডাক নিলে। এবং চলে গেল।

পিওন এবার ডাকলে—ইউনিয়ন বোর্ড। কে এসেছিস ? নোটনা রে !

নোটন চৌকিদার এগিয়ে এল—এই যে আজ্ঞে।

—এই ইউনিয়ন বোর্ড আর এগুলো তো সিডেন সাহেব দাশরথি-বাবুর নিজের। ইস্কুলের কে রয়েছে ?

দুটি ছেলে এগিয়ে এল।—দিন।

ছেলে দুটি ডাক নিয়ে চলে গেল।

একজন বললে—আমার কিছু আছে রামলাল ?

—কে ? গোপেশ্বরদাদা ?

—হ্যাঁ ভাই। আমার চিঠি আজও আসে নাই?

—কই দাদা! দেখছি না তো!

--তা হলে? নারায়ণ নারায়ণ! আজও চিঠি পেলাম না ছেলেটার! চোখে খুব পুরু চশমা, গায়ে ফতুয়া, হাতে লাঠি ঠুকঠুক করে চলে গেলেন।

আর একজন হাঁকলে ও বামলাল! শুনছ!

—হ্যাঁ।

—আমি হে!

—বসুন সুরেশবাবু। বসুন। দিচ্ছি। তাব আগে বমেন্দ মুখুজ্জে!—রমেন্দবাবু—।

পিওন মুখ বের করে একখানি বঙিন চিঠি বাড়িয়ে ধরলে। রমেন এগিয়ে এল। পিওন এবং সে দুজনেই একটু হাসলে।

সুরেশ বললে—রঙিন খাম যে! অ্যা! চোখের ভুরু দুটি নেচে উঠল।

পিওন হেসে বললে—খোসবই আছে, ভুরভুর করছে।

—বকশিশ আদায় কর রমেনের কাছে। সুরেশ বললে।—প্রথম বউয়ের চিঠি! হ্যাঁ-হ্যাঁ! রমেন ফিক করে হেসে দ্রুত চলে গেল।

আবার সুরেশ বললে—দাও না রামলাল কাগজখানা; একবার দেখে নি!

পিওন রামলাল একখানা খবরের কাগজ বের করে সুরেশের হাতে দিয়ে বললে—যত্ন করে খুলবেন মশায়; দেখবেন যেন লাগে না খায়। পরের কাগজ—ভারি চটে যায়। রিপোর্ট করলে আমাদের বিপদ হবে।

এক তরুণ বাইসিক্লেটি চেপে এসে দাওয়ায় পা রেখে বাইসিক্লে চেপে থেকেই বললে, রামলাল আমার ভারতবর্ষ প্রবাসী—

—আজ তো আসে নি বাবু।

—সে কি? আজও বাংলা মাসের ২রা হয়ে গেল হে! চিঠি?

—চিঠিও আজ নাই আপনার।

—ধুৎ তেরি। সে বাইসিক্ল হাঁকিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে সুরেশ কাগজ খুলে দেখেই বললে—ওরে বাপরে! কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত! ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিবার জন্য গরমপন্থীদের সংকল্প। ১৯৩০ সালের পূর্বে মীমাংসা না হইলে আন্দোলন আরম্ভের ব্যবস্থা।

পাশের লোকজন ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর।—দেখি—দেখি।

মাস্টার ভিতর থেকে বললেন—গোলমাল করছেন কেন এত! আস্তে আস্তে পড়ুন না। বামলাল! দীনু কই? দানু?

দীনু তামাক খেতে খেতে অন্তরালে চলে গিয়েছিল।

ঘরের ভিতর থেকে বামলাল হাঁকলে—দানু! এই দীনু! কোথা গেলি রে?

মাস্টার বললেন—দেখ আবার চলে গেল কিনা। নতুন লোক। ওকে বলেছিলে—কাগজে টিপ দিতে হবে?

—সে তো কালই বলে দিয়েছি। ও দীনু!

অন্য দরজা দিয়ে দীনু ঘরে ঢুকল।—আজ্ঞে হুজুর এই আছি আমি।

মাস্টার বললেন—আছিস! আচ্ছা। বলেই কাজে মন দিলেন।

—দে—দে এই কাগজে টিপ দিয়ে দে!

মাস্টার কাজ করতে করতেই বললেন—হ্যাঁ। ডাক এনে দিয়ে বসে থাকবি। সব মিল হয়ে গেলে কাগজে টিপ দিয়ে তবে ছুটি।

বাইরে জানালাব ওপার থেকে কে বললে—তুখানা পোস্টকার্ট আর একখানা খাম দেবেন বাবু!

মাস্টার হাত বাড়ালেন—পয়সা। ওদিক থেকে একখানা হাত ঢুকল।

মাস্টার পয়সা দেখে বাক্সে ফেলতে ফেলতে পিছন ফিরেই বললেন—দীনুকে ঘাসের কথা বলেছ রামলাল। আমার গোরুর জন্যে এক বোঝা করে ঘাস আনবি দীনু। বুঝলি!

দীনু টিপ দিয়ে মাথায় আঙুলের কালি মুছছিল। সে প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে?

--এক বোঝা করে ঘাস আনতে হবে রোজ।

—ঘাঁস?

রামলাল বললে—হ্যাঁরে বাবা ঘাস। গোরুতে খাবে। যে হরকরা থাকে সেই আনে।

মাস্টার বললেন—আমি মাসে তোকে কিছু করে দেব। বুঝলি? তোরা না-দিলে আমার চলবে কী করে? ওবেলা—সেই সন্ধ্যের সময় যখন ডাক নিয়ে যাবার জন্যে আসবি—তখন, তখনই আনলেই চলবে।

রামলাল বললে—যা-তা ঘাস আনিস না। ভালো ঘাস। সন্ধ্যেতে ঠিক সময়ে আসবি। কী, দাঁড়ালি কেন?

—ইগুলান নিয়ে যাব?

দীনু পকেট থেকে খান দুয়েক রঙচঙে খাম ও মোড়ক বের করলে।

রামলাল সবিস্ময়ে বললে—দেখি--দেখি। পেলি কোথা ?

—পোস্টাপিসের সামনে পড়ে ছিল। বাবুরা ফেলে দিয়েছে—কুড়িয়ে নিলাম।

—হুঁ। রমেন্দর বউয়ের চিঠির রঙীন খাম। খোসবু উঠছে। এটা তো বিলিতী মাস্টারের জার্মানির কুষ্টির মোড়ক।

—লোব ?

—তা নিয়ে যা। কিন্তু করবি কী ?

—ছেলেটাকে দোব।

মাস্টার কাজ করছিলেন—হঠাৎ ঘুরে দীনুর দিকে তাকালেন—তারপর হাত বাড়িয়ে দেওয়াল থেকে একখানা শেষ-হয়ে-যাওয়া ক্যালেণ্ডার খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছেলে বুঝি ছবি ভালোবাসে ? এই নে !

দীনু উজ্জ্বল আনন্দে দীপ্ত হয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থ হয়ে হাত বাড়িয়ে ছবিখানা নিলে।

দীনু বেরিয়ে গেল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে কাগজখানা মোড়কে পুরে হাতে করে ঘরে ঢুকল।

—এই নাও হে রামলাল। একেবারে ভাঁজে ভাঁজে মুড়ে ঠিক করে দিয়েছি।

ধপ করে ফেলে দিল। তারপর বললে—ও মাস্টার।

—হুঁ। বলো।

—বলব ? বলে বলে তো মুখ শুকিয়ে গেল হে ! রোজ রোজ আর কত বলব ?

—পাঁজি ?

—তা ছাড়া কি কারুর একখানা ইনসিওর আমাকে দাও বললে দেবে তুমি ? পাঁজি একখানা—ওই বিজ্ঞাপনের একখানা পাঁজি আর একটা ক্যালেণ্ডার।

—দোব। এই গাদা দরুনে যেদিন আসবে --সেদিন দোব।

—এই তো মেলাই এসেছে বাবু, দাও না একটা পাঁজি !

—আজ যদি না দাও তো আর চাইব না। আর দাবা খেলতেও আসব না। হ্যাঁ। এই নিলাম আমি একখানা। বলেই সে তুলে নিল।

—আরে আরে দেখে নাও, কার নামের নিচ্ছ। রামলাল দেখে দাও হে !

—এ কোথাকার কে—হরিলাল ঘোষ—সাকিম কুড়ুম শা-

বাইরে থেকে ওভারসিয়ার ডাক দিল —মাস্টার মশাই।

বাঁড়ুজ্জে তাড়াতাড়ি কামিজ তুলে পেটের কাপড়ের তলায় গুঁজতে লাগল। এবং মাস্টারের বাড়ির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হল।

মাস্টার কিন্তু চমকালেন না ; তিনি হেসে উত্তর দিলেন—হরি হে রাজা কর ! জয় ওভারসিযার বাবু ! আসুন আসুন।

বাঁড়ুজ্জেকে বললেন —ভয় নাই। আমাদের মধুবাবু- -ওভার-সিয়ার। কিন্তু তার আগেই বাঁড়ুজ্জে সরে পড়েছে।

ওভারসিয়ার ঢুকলেন—বয়েস হয়েছে, শক্ত শরীর ; এক হাতে লাঠি, কাঁধে ঝোলানো পোস্টাপিসের একটা হলুদ ব্যাগ। বলতে বলতে ঢুকলেন—হরি হে রাজা কর। কিন্তু হরি কানে কালা। শুনতে পান না। জীবনটা মাঠে মাঠে হেঁটেই কাটল। সিংহাসন

বলতে দূরের কথা, কাঠের চেয়ারেও একদিন বসে আরাম করতে পেলাম না। টুলটা দাও হে রামলাল, বসি। একটু চা খাওয়ান মাস্টার মশাই।

বাইরে কথাগুলি বলে প্রায় শেষের দিকে ঘরে ঢুকল ওভারসিয়ার। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখলে।

রামলাল বাড়ির ভিতরের দিকের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললে—মিনু মা, দু কাপ চা চাই মা। ওভারসিয়ারবাবু এসেছেন, খাবেন এখানে।

ওভারসিয়ার বললেন--উঁহু! উঁহু! তবে আর বললাম কী এতক্ষণ? এখুনি চা খেয়েই যাব—টিকুরী। ব্যাগ থেকে শালপাতায় মুখ মোড়া একটি ভাঁড় বের করলেন কথা বলতে বলতে। রামলালের হাতে দিয়ে বললেন—মিনুকে দিয়ে এস রামলাল। সিউড়ির মোরব্বা। রামলাল নিয়ে চলে গেল। তারপর ওভারসিয়ার আগের কথার জের টেনে বললেন --ঝামেলার কথা আর বলবেন না। টিকুরী থেকে আবার ফিরতে হবে আজই।

– আজই?

—হ্যাঁ। আপনাদের নতুন লাইন হয়ে রাত্রেই বোলপুর!

—দেখবেন। সুদীপুরের বটতলায় বলে ভূত আছে।

—ইংরেজ রাজত্ব মশায়। গভর্মেণ্ট সারভেণ্টকে ভূতেও ভয় করে। আর ভূতের ভয় করলে কি এই চাকরি করা চলে! নতুন লাইনের রিপোর্টের জন্যে তাগাদা এসে গিয়েছে।

—চোখ বুজে রিপোর্ট দিয়ে দিন। মাস্টার বললেন।—লোকটা সাচ্চা!

—সাচ্চা সে আচ্ছা মশায়। এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বোলপুর পৌঁছোয়। বেটা ঘোড়ার মতো দৌড়োয়।

ঠিক এই সময়েই দূরে—শাঁখ এবং উলুর ধ্বনি উঠল। এবং এই সময়েই রামলাল ও মিনু দুটি কাচের প্লেটে দুটি করে মোরব্বা এবং দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে ওভারসিয়ারের হাতে দিল ও মাস্টারের টেবিলে নামিয়ে দিল।

মিনু বললে—জল লাগবে বাবা?

—লাগবে বই কি। হাত ধুতে হবে তো!

রামলাল ও মিনু চলে গেল। এঁরা মোরব্বা মুখে তুলে চিবুতে লাগলেন।

মাস্টার চিবুতে চিবুতে বললেন—আগের সে মোরব্বা আর নেই।

এর মধ্যে শাঁখ এবং উলু বেজেই চলেছিল। ওভারসিয়ার বললেন—সবই ভেজাল যে। যুগটাই যে ভেজালের। বলে প্লেটটা নামিয়ে রেখে বললেন—এত শাঁখ উলু? বিয়ে না কি? তারপরই বললেন—চৈত্রমাসে বিয়ে?

মাস্টার হেসে বললেন—রেজেস্ট্রীর যুগ। চৈত্র মাসে বিয়েতেই বা বাধা কী?

—যা বলেছেন। চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন—বোলপুর থেকে এখানে ফেরে কতক্ষণে বলুন তো?

মাস্টার বললেন—দীনুর কথা বলছেন? আমরা উঠবার আগেই ও এসে বাইরের বারান্দায় বসে থাকে। পাঁচটা কি পাঁচটার দু-চার মিনিট আগেই হবে। ওই দু ঘণ্টা—

ওদিক থেকে রামলাল জল নিয়ে ঢুকছিল।

এদিকে থেকে রামলাল, রামলাল বলে চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন সুরেশ বাঁড়ুজ্জে। পরস্পর প্রায় ধাক্কা লেগে গেল। রামলালের হাতের জল পড়ে গেল।

ওভারসিয়ার পোস্ট মাস্টার বলে উঠলেন, আরে—আরে চিঠি ভিজল—চিঠি ভিজল।

পোস্ট মাস্টার বললেন,—কী যে তোমার কাণ্ড বাঁড়ুজ্জে! তারপর হঠাৎ চটে উঠে বললেন—কী? কী? রামলালকে নিয়ে কী দরকার? জল-টল ফেলে সুরেশ বসে পড়ে জল ওপাশ দিয়ে হাতে করে ছিটিয়ে দিতে দিতে বললে—

—ভিজবে না ভিজবে না। ঠিক করে দিচ্ছি। এই নাও এই নাও! জল ছিটিয়ে ওদিকে ফেলে দিল।—এই নাও। বাবাঃ—। কিন্তু রামলাল—তুই যা—যা এখুনি যা বকশিশটা আদায় করে নিয়ে আয়। যা—।

—কিসের বকশিশ? সুরেশ তুমি একটা আস্ত—কী বলব—! এমন কর—

—যা বলবে বল—আস্ত উল্লুক—ভল্লুক—যা বলবে। এমন করি সাধে। মস্ত বড় কাণ্ড। শাঁখ বাজছে শুনছ না—উলু পড়ছে শুনছ না? শিবু রায়বাবুর নাতির বেটা ছেলে হয়েছে। শিববাবুর বাবা—বুড়োকে নিয়ে চার পুরুষ। হৈ-হৈ কাণ্ড। গাঁয়ে মিষ্টি বিলুবে। নোটা চৌকিদার চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—সে বেটা দু টাকা বকশিশ পেয়েছে। পিওনকে বকশিশের হুকুম হয়ে গিয়েছে। মাস্টারের বাড়িতে থালা-ভর্তি সন্দেশ আসছে। রামলাল তুই শিগগির যা। টাটকা টাটকা গেলে—বেশী পাবি। গরম গরম—বুঝলি না।

বাইরে থেকে জানালা দিয়ে একখানি হাত ঢুকল—ওপাশ থেকে বললে—একখানা পোস্টকার্ট মাস্টেরবাবু।

একটি সভ্য কণ্ঠের কথা শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে—একখানা মনি-অর্ডার ফর্ম দেবেন আমাকে।

বরাবরই শাঁখ উলু বেজে যাচ্ছে ক্রমশ কমে আসছিল অবশ্য। এবার থামল।

ওদিকে তখন দীনুর বাড়িতে উঠানে হুঁকো কল্কে হাতে দীনু দাঁড়িয়ে আছে। উঠানের একপাশে দড়ি টাঙিয়ে একখানি ঘরের ছক পাতা হয়েছে, দড়ির পাশে পাশে দাগ টানাও হয়ে গেছে কোদালের কোপ দিয়ে। এক জায়গায় খানিকটা মাটি খোঁড়া রয়েছে। হুঁকো হাতে দীনু ঘাড় বেঁকিয়ে ঘরখানির ছক যেন পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে পরখ করে দেখছে।

উঠানের একপাশে দু বোঝা ঘাস পড়ে রয়েছে।

স্ত্রী সদু কাঁখে করে এক কলসী জল নিয়ে এসে দাঁড়াল।

বললে—এখনও সেই দাঁড়িয়ে রইচ? না বাপু! আচ্ছা মানুষ যা হোক।

দীনু বললে—আধহাত করে চারিপাশে বাড়িয়ে দোব কিনা ভাবছি।

—বাড়িয়ে দেবা? ক্যানে? গোরুগুলার লেগে ছপ্পর খাট পেতে মশারি টাঙাবা না কি? বাড়িয়ে দেবে! সব তাতেই আদিখ্যেতা।

—ক্যানে? আদিখ্যেতা কী হল?

—হল না? বললাম গোয়ালের ছোট দুয়োরে মাথাটো ঠোক্কর

লেগে কেটে যেয়েছে। আমি দিব্যি করেছি বর্ষার আগে নতুন গোয়াল করাব।

—তাই তো করছি।

—তাই তো করছি? তাই বলে আজই? বলে ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। শোনবামাত্র দড়ি টাঙিয়ে বলে আজ বনেদের পত্তন করব। সারা রাত বলে ডাক বয়েছ, জেগেছ- -

—দূর! সারা রাত ডাক বইতে হয় নাকি? রাত নটার সময় ডাক ফেলে দেলাম- -বাস তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুম। সেই তিনটে পর্যন্ত। শ্যাষ রাত। ভুলকো তারা ওঠা পর্যন্ত। তারপরে ডাক নিয়ে ফের রওনা। ভোর-ভোর লবগেরাম। চাকরি খুব সুখের সত্থ! তবে দুখও আছে।

সত্থ কলসী নিয়ে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হল।

বললে—দুখ আবার কী? সেটো কী বটে?

—ঘুম হয় না।

—ক্যানে? কলসীটা সে নামালে।

—ভাবি—ঘরে একা শুয়ে তু গুনগুন করছিস—-

চৈত মাসে শিবদুগ্যা গাজনে নাচে জোড়ে।

এ হেন সুখের দিনে আমার বঁধু নাইকো ঘরে!

—মরণ। দায় পড়েছে আমার! অ্যাই—অ্যাই—ই ছোঁড়ার কাণ্ড দেখ।

এ্যাই—অ্যাই ওরে নেতাই অ্যাই –! ঘরের ভিতরের দিক লক্ষ্য করে কথা বলছিল সত্থ বউ। সে ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকল।—ভাঙবে রে, ভাঙবে।

ঘরের ভিতরে নিতাই শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। প্রচুর পরিমাণে মহুয়া ফুল খেয়ে বেশ যেন নেশায় মেতেয়া গিয়েছিল। ঘুম ভেঙ্গে এখন সে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে দু-হাতে একটা জলসুদ্ধ ছোট কলসী তুলে খাচ্ছিল—জলে তার বুক মুখ ভাসছিল। মা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই কলসীটা হাত থেকে খসে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

সন্থ বললে—ভাঙলি তো?

ধূলামাখা গায়ে জল পড়ে চিত্রবিচিত্র নিতাই হি-হি করে হাসতে লাগল।

—হাসছে দেখ ক্ষ্যাপার মতো। অমুনি করে মৌফুল খায়? ছেলে একেবারে মদখেগো মাতালের মতো লাটাচ্ছে।

ছেলেটা তবু হাসতে লাগল।

দীনু ঘরে ঢুকে বললে—বকিস না এখন। আমানি খেতে দে ওকে। ঠাণ্ডা হবে। আর ঘুমুক; ঘুমুতে দে।

দেওয়ালের গায়ে ইতিমধ্যেই ক্যালেণ্ডারটি টাঙানো হয়েছিল, সেখানা খানিকটা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেখানা সোজা করতে এগিয়ে গেল দীনু। বললে—এই দেখ, এটা আবার বেঁকালে কে?

সেখানা সোজা করে একটা ভাঁড় থেকে হাত চুবিয়ে খানিকটা তেল নিয়ে মাথায় ঘষতে ঘষতে বললে—আমি চান করে আসি। ভাত খেয়ে খানিকটা শোব। বুঝলি।

সন্থ বলে উঠল —ওই—ওই—এই দেখ—ই হারামজাদার আবার কাণ্ড দেখ।

নিতাই জল-পড়া জায়গাটার কাদার উপর শুয়ে পড়েছিল।

এবার দীন্নু তার হাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে টেনে বললে—নাঃ তোকে আর দু-চার চড় না দিলে চলছে না। বড় বেয়াড়া হয়ে গেলি। ওঠ। চল—চল আমার সঙ্গে চান করবি চল। নেতাই!

—যা, আমি যাব না।

—নেতাই! এবার একটা ঝাঁকি দিলে দীন্নু।

নেতাই থু-থু করে থুথু দিয়ে দিলে।

—নেতাই! ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল দীন্নু।

নেতাই আবার থুথু দিলে।

দীন্নু ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। সে নিষ্ঠুর ক্রোধে হাত তুললে—মারবে সে ছেলেকে।

সদু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আটকালে।—না—না—না।

—না—না—ছাড়। তুই ওর মাথা খেলি।

—আমার তিনটে মরে ওই একটা। তোমার পায়ে পড়ি।

—সে তিনটে বুঝি আমার ছিল না? আমার বুঝি আরও তিনটে আছে? ছেড়ে দে, সদু ছেড়ে দে।

সদুকে ঠেলে ফেলে নিতাইকে ঝাঁকি দিতে দিতে সে নিয়ে চলে গেল।

সদু বেরিয়ে এল দাওয়ায়। নামতেও গেল। কিন্তু কী ভেবে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জল পড়ল না।

উঠানের পলাশ গাছটা থেকে একটি একটি করে ফুল ঝরে পড়তে লাগল।

হঠাৎ সদু এক সময় যেন সচেতন হয়ে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকল

এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়ে ঢেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে উঠল।

তাদের ঘরের মতোই ঘরদোর।

ডাকলে—বিলাসী! অ বিলাসী!

বিলাসী ঘরের ভিতর থেকে উত্তর দিলে—কে?

—আমি লো। সতু। শোন একবার।

-কী? বেরিয়ে এল বিলাসী।

—এই এঁচোড়টো তু লে ভাই।

—ক্যানে? আমার তো রয়েছে। আমার রাখু যে তোর নেতাইয়ের সঙ্গে ছিল। বাবুদের বাগানে দুজনাতে একসঙ্গে ঢুকেছিল যে। রাখু দুটো এনেছে।

—জানি। কিন্তু নেতাইয়ের বাবা আজ খুব এগেছে। এর ওপরে যদি জানতে পারে যে পরের বাগান থেকে চুরি করে এনেছে তা হলে আর অক্ষে থাকবে না! তু আখ ভাই। বরং ব্যান্নন এঁধে একটুকুন দিয়ে আসিস। বুঝলি। যাই ভাটি আমি।

এঁচোড়টা ফেলে দিয়ে সে দ্রুতপদে ফিরে এল বাড়ি। সেখান থেকেই দেখতে পেলে খানিকটা দূরে দীনবন্ধু স্নান সেরে ছেলেকে স্নান করিয়ে কোলে করে নিয়ে ফিরছে। বাপ ছেলেতে ভাব হয় নি, ছেলে কাঁদছে, বাপের আর তোষামোদির বাকি নেই। ছেলেকে শালুক তুলে গলায় মাথায় জড়িয়ে দিয়েছে। মধ্যে মধ্যে চিবুকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে চেষ্টা করছে।

সতু তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ভাত বাড়তে বসল।

নিতাই বাড়তে বাড়তেই শুনলে—দীনু বলছে—বুঝলি কি না,

তারপরেতে গোয়াল ঘরটা এবার তৈরি করেই আসছে বার একখানা কোঠাঘর করব্। সোন্দর কোঠাঘর। চাকুরি তো ধর আত্তিরে। তাও নটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘুমুতে পাব। বাস সকালে এসে দিবিলোকে ঘর ছাউনির কাজ করতে পারব। দেয়াল বাড়ুইয়ের কাজ় করতে পারব। চাকরির মাইনে পনেরো টাকা—ইদিকে সে ধর দিন এক টাকা। তিরিশ টাকা। ভাবনা কী! তোকে পাঠশালাতে ভত্তি করে দোব। নাইট ইস্কুলে! বুঝলি। হ্যাঁ। দিনে কাজ করবি। তোকে আমি আজ মিস্তিরীর কাজ শেখাব, বুঝলি। তা পরেতে তোর বিয়ে দোব। হ্যাঁ-। ওই পাশে তখন আর একখানা কোঠাঘর করব।—

সত্নু স্থির হয়ে শুনছিল। আনন্দে তার হাত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মুখে মৃত্নু হাসি ফুটে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ত্নুটি চোখ দিয়েও গড়িয়ে এসেছিল জলের ধারা।

হঠাৎ চাল থেকে থপ করে একটা টিকটিকি মেঝের উপর খসে পড়ে তার এই তন্ময়তার আবেশ ভেঙে দিল।

ভয় পেয়ে যেন চমকে উঠল সত্নু, মৃত্নু স্বরে বললে—মা গো। তারপরই বললে, মর মর। যাঃ—যাঃ।

টিকটিকিটা পালিয়ে গেল।

সত্নুর হাত দ্রুত চলতে লাগল।

ত্নু থালা ভাত ত্নু হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

তখন দীনু ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। নিতাই শান্ত হয়েছে—শালুক ফুলের ডাঁটিটা পাক দিয়ে মাথায় বাঁধছে, আর বলছে, আমাকে একটা ত্নু চাকার গাড়ি কিনে দিস বাবা!

—দোব। বড় হ। দোব কিনে। আমি বুড়ো হলে পেনসিল্ লোব—তোকে ডাকহরকরার চাকরি করে দোব।. তু তু চাকার গাড়িতে চেপে সোঁ—সোঁ করে ডাক নিয়ে চলে যাবি।

সত্নু হেসে বললে—তাই দেবে। এখন ভাত খাও।

দীনু এসে ভাতের থালার সামনে বসে বলতে লাগল—আমার মতো জ্যোস্তা নাই, আঁধার নাই, খরা নাই, বর্ষা নাই, জল নাই, ঝড় নাই, শীত নাই, ওই সুঁদীপুরের ভুতুড়ে বটতলা দিয়ে ধুকুর—ধুকুর করে—

জ্যোৎস্নালোকিত বটতলা ও অরণ্যভূমের মধ্য দিয়ে দীনু ডাক নিয়ে চলে যায়।

অন্ধকার রাত্রিতে চলে যায়।

চলে গেলেই বটগাছে খরখর শব্দ ওঠে, ঝরঝর করে কিছু ঝরে পড়ে।

ঝড় ও বিদ্যুতের মধ্যে পার হয়ে যায় দীনু।

কোনো দিন দূরে শেয়াল ডাকে। কোনো দিন কুকুর ডাকে।

আধো-জ্যোৎস্না আধো-মেঘলার মধ্যে যেদিন যায়, সেদিন ময়ূর ডাকে।

শেষ চলে শীতের রাত্রে চলে।

সেদিন প্রথমেই মাঠে কাটা ধান দেখা যায়। আকাশে জ্যোৎস্না। মধ্যে মধ্যে গাড়ির আঁট দেখা যায়। গোরুর গাড়ি খুলে দিয়ে পথে গাড়োয়ানেরা বিশ্রাম করে। মাঝখানে আগুন জ্বলে। তারপর অরণ্যভূম আরম্ভ হয়। সুঁদীপুরের বটতলা আসে। সেদিন ঝরঝর

করে তার মাথাতেই ঝরে পড়ল কিছু। গাছে খরখর শব্দ উঠল। দীনু থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে ডাকটা নামিয়ে লাঠিটা খুলে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে একটা ঝুলে পড়া ডালে সজোরে মারলে লাঠি।

ধপ করে কিছু পড়ল। দীনু ঝুঁকে দেখে সেটার লেজ ধরে টেনে তুললে। সেটা বেজী জাতীয় জানোয়ার। নাম খটাস্। গাছেই ওদের বাস। সারা রাত্রি গাছের ফল খায়—মানুষ গেলেই ডালে ডালে ছুটোছুটি করে। সেটাকে নিয়ে—ডাক কাঁধে তুলে আবার ছুটল দীনু।

এসে উঠল বোলপুর পোস্টাপিসে। ভিতরে সেই টেলিগ্রাফের টক-টক শব্দ! চিঠিতে মোহর মারার শব্দ উঠছে। বাইরে একটা আলো ঝুলছে। দীনু ডাক নামিয়েই সোৎসাহে বললে—মাস্টারবাবু।

– দীনু?

—সুঁদাপুরের বটগাছের ভূত মেরে এনেছি দেখেন।

—ভূত মেরে এনেছিস?

—এই ছাখেন না কেনে?

মাস্টার পিওন সব ভিড় করে এল।

—এটা কিরে?—এ্যাঁ।

—খটাস জানোয়ার মশায়। বুয়েছেন না, বেটারা গাছে একেবারে গেরান শহর বানিয়ে বাসা বেঁধেছে। এতে বেটাদের মাতন লাগে। ফল খেয়ে বেড়ায়, ঝাঁপাঝাঁপি করে, নিচে দিয়ে মানুষের সাড়া পেলেই হুড়মুড় করে ছুটে পালায় গাছের কোটরে। খরখর শব্দ ওঠে গাছময়; আর পাকা ফল ঝরে ঝরঝর করে। কারুর মাথায়

জলত্যাগ করে দেয়। আজ এক বছর মশায়—রাম রাম রাম রাম বলতে বলতে পার হয়েছি। বুক ঢিপঢিপ করেছে। সে কী বলব বাবু। আজ বুঝেছেন না, জ্যোস্তা ছিল, আর চোখে হঠাৎ পড়ে গেল। দেখি একটা ঝুলে পড়া ডালে ছোট মতো কালো পারা কী নড়ছে—চোখ দুটো জুগ-জুগ করছে। আমি মশাই ডাক নামিয়ে—লাঠিখানা নিয়ে—জয়কালী বলে দিলাম ঝেড়ে। আর ধপাস করে পড়ল বেটা--।

হা-হা করে হাসতে লাগল সে।

মাস্টার বললেন—চামড়াটা আমাকে দিস বুঝলি। নুন দিয়ে বায়েনদের দিয়ে– পাঁঠার চামড়া যেমন করে দেয়—তেমনি করে দিস। কেমন?

—দোব আজ্ঞে। নিশ্চয় দোব।

মাস্টার বললেন—তোর তো একবছর হয়ে গেল কাজ?

—আজ্ঞে তা হল।

—আর একটা কাজ করবি? এখান থেকে ইস্টিশানে ডাক নিয়ে যাবি, আবার নিয়ে আসবি। এখানে ঘুমোস, ইস্টিশানে ঘুমুবি। তবে হ্যাঁ—একঘণ্টা দু ঘণ্টা বেশী জাগতে হবে। পারবি? মাইনে আরও দশটাকা পাবি।

ইতিমধ্যেই আরও চার-পাঁচজন হরকরা ডাক নিয়ে হাজির হল।

মাস্টার পিওন এরা ঘরে ঢুকল। মাস্টার দ্রুত গিয়ে টেলিগ্রাফে হাত দিল। পিওনেরা কাজে বসল। মোহর করা চলতে লাগল। দীনুর ডাক কাটা হতে লাগল। দীনু বসল।

বাইরে অন্য ডাক-হরকরারা খটাসটাকে ঝুলিয়ে দেখতে লাগল।

একজন বললে—দীনু বাহাদুর বটে বাপু!

—হুঁ হুঁ—শুধু দীনু লয়, দীনবন্ধু!

—খটাস মেরে লতুন চাকরি হয়ে গেল। চামড়া দিয়ে কাজ হাঁসিল।

—আমি একটো কাঠবিড়িলী মেরে আনব, দাঁড়া।

ভিতর থেকে পিওন ডাকলে—ডাক আন, সব কী গজর-গজর করছিস? ডাক আন। স্টেশনে যেতে হবে। ডাকগাড়ির সময় পাল্টেছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট এগিয়ে এসেছে। ডাক আন।

দীনু স্টেশনে সেদিন ডাক নিয়ে গিয়ে—ডাকগাড়ি দেখে অবাক হয়। এত আলো! এত লোক!

পরের দিন সকালে ডাক পৌঁছে দিয়েই বাড়ি ফিরে সত্থকে বললে।—সত্থ তখন ঘব নিকুচ্ছিল। পাশে একটি মাচাতে লাউয়ের লতা উঠেছে। লাউ ঝুলছে। চারিদিকে একটি স্বল্প সমৃদ্ধি ও শ্রী যেন ফুটি-ফুটি করছে।

গোয়াল ঘরটা তখন সম্পূর্ণ; চালেব উপর নতুন খড় ঝলমল করছে।

দীনু ঘরের দিকে তাকিয়েই বললে।

—সত্থ!

—হুঁ। সত্থ নিকিয়েই চলল।

—হুঁ লয়, হুঁ লয়। শুধু হুঁ বললে হবে না।

—তবে কী বলব? কী হল?

—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলতে হবে। এবারে কোঠা ঘর। ঘর হয়ে গেল। ফের নতুন চাকরি। বোলপুরেই পোস্টাপিস থেকে

ইস্টিশানটুকু ডাক নিয়ে যেতে হবে আসতে হবে। এই পো-খানেক পথ। বাস্ দশটাকা মাইনে। আর সে-ডাক গাড়ির সে কী শোভা সত্থ। ডাক গাড়ির কী শোভা! কী আলো! কত নোক! ঝলোমল করছে। কলকল করছে। ওঃ লয়ন সাথক হয়ে গেল।

ঘর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল নিতাই।

—আমাকে একটো পেন্টুল—হাফ পেন্টুল কিনে দিতে হবে বাবা। সে গলা ধবে ঝুলে পড়ল।

দীনু কোলে তুলে নিলে।

সত্থ বললে—আগে বড় ঘরের চাল ঝেড়ে ছাওয়া হোক দাঁড়া।

দীনু বললে—হবে। হবে। সব হবে। আজই খড় বায়না করব। ধারে লোব। দুমাসে শোধ দোব। কুছ পরোয়া নাই। পেন্টুলও আমি কাল এনে দোব বোলপুর থেকে।

নিতাই বললে—লোটন কাকা কী বলে জান? কুছ পরোটা নেহি। বলে হি-হি করে হাসতে লাগল।

দীনু এগিয়ে গেল মাচার দিকে। একটি লাউ তুললে।

সত্থ বউ তখন নিকানোর কাজ শেষ করে উঠছে। বললে—আহা-আহা কচি কচি—এখনও অনেক বড় হবে।

—পায়েস করতে কচিই ভালো। মাস্টার মশায়কে দিতে হবে, পায়েস করে খাবে। বুঝলি। লতুন চাকরিটা পেলাম! আর সনজেবেলা একটা নিয়ে যাব বোলপুরের মাস্টারের জন্যে। আমি দিয়ে আসি দাঁড়া।

নবগ্রাম পোস্টাপিসের সামনে ইট চুন সুরকি পড়ে আছে।

মাস্টার ঘরের মধ্যে কাজ করছেন। সুরেশ বাঁড়ুজ্জে বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে। রামলাল চিঠির থাক গোছাচ্ছে ঘরের মধ্যে। দীনু বারান্দা অতিক্রম কবে ঘবে গিয়ে ঢুকল।

—মাস্টার মশায়।

—অ্যাঁ?

দীনু লাউটি নামালে।

রামলাল বললে—লাউ? এ যে নেহাত কচি রে।

—আজ্ঞে আমার গাছের। মাস্টার মশায় পায়েস করে খাবেন।

মাস্টার ঘুরে তাকালেন। কিন্তু তোব পাঁঠা কী হল রে? লাউ দিয়ে সারছিস?

—আজ্ঞে না। এবারেই ধরম-পুজোতে, এই বোশেখ মাসে। সে-পাঁঠা আমি যতন করে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ পুরুস্টু করে রেখেছি।

সুরেশ এসে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে বললে—তাব আগেই যে মাস্টার চলে যাচ্ছে।

- চলে যেছেন?

—আমার বদলির হুকুম হয়ে গেছে দীনু। মাস্টার বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

রামলাল বললে—এই সপ্তাহেই চলে যাবেন।

সুরেশ বললে—দে দে, তার আগেই লাগিয়ে দে বাবা! ধরমের নামের পাঁঠা দে গাজনেই শিবের কাছে—খাজ্জিং জিং জিং করে দে। বলো শিবো ধরমজ্জো—যে ধরম সেই শিব।

দীনু বললে—আপুনি চলে যেছেন বাবু! হতাশার সুরে অকৃত্রিম বেদনার সঙ্গে কথা কটি বললে সে!

মাস্টার বললেন—চাকরির এই নিয়ম দীনু! তোদের পোস্টাপিস বড় হল—সাব-পোস্টাপিস হল;—দেখছিস তো—ইট চুন সুরকী এসেছে, পাকা থামের বারান্দা হবে। পাকা মেঝে হবে। আমি ব্র্যাঞ্চ পোস্টাপিসের মাস্টার, এখান থেকে চলে যেতে হবে। আবার যে আসছে—সেও দু বছর চার বছর থেকে চলে যাবে। আবার নতুন মাস্টার আসবে। এই নিয়ম।

সেই নিয়মানুসারে—নতুন পোস্টমাস্টারকে দেখা যায় নবগ্রাম পোস্টাপিসে।

মাস্টার খিটখিটে ডিস্‌পেপটিক লোক। বয়স হয়েছে। দেখা যায় অপরাহ্ণে পাকা বারান্দায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। দেওয়ালে কতকগুলি মোটা হরফে লেখা নোটিশ টাঙানো হয়েছে—সেগুলি পড়ে দেখছেন।

"ডাক বিলির সময় কেহ ভিতরে ঢুকিবেন না। বাহিরে গোলমাল করিবেন না।"

"খাম পোস্টকার্ড টিকিট বিক্রয়ের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে পোস্টেজ বিক্রয় হইবে না।"

"মনিঅর্ডার রেজেস্ট্রীর জন্যে নির্ধারিত সময়—১০টা হইতে ১২টা। ১টা হইতে ২টা।"

"যে-কোনো কাজই থাকুক, মাস্টার মশায় মাস্টার মশায় বলিয়া ডাকিয়া বিরক্ত করিবেন না।"

"বিনা প্রয়োজনে পোস্টাপিসের কম্পাউণ্ডে কেহ ঢুকিয়া ঘোরা-ফেরা করিবেন না। কাজে আসিয়াও তর্ক তকরার বা চিৎকার করিবেন না"—

ঠিক এই সময়ে এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়া দীনু প্রবেশ করিল এবং বারান্দার অপর দিকে ভুম করিয়া ফেলিয়া দিল।

মাস্টার চমকিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন। তার পরই সামলাইয়া লইয়া চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—Who are you? What's that? কোন হ্যায় তুম? কেয়া হ্যায় উ?

দীনু বিহ্বল হইয়া বলিল—হুজুর।

—কে তুমি? কে? এ সব কী?

—আজ্ঞে হুজুর আমি দীনু ডাকহরকরা।

—দীনু ডাকহরকরা? রানার? কিন্তু এসব কী? ঘাস কেন পোস্টাপিসে?

—আজ্ঞে আপনকার জন্যে—

—What? আমার জন্যে—? ঘাস নিয়ে কী করব আমি? আমি ঘাস খাই? আমার জন্যে—ঘাস?

—আজ্ঞে, হুজুরের গোরুর জন্যে।

—নো। নো। হুজুরের গোরু নাই। শোনো আমার গোরু-টোরু নাই। ঘাস আমার দরকার নাই। ঘাস কোনো দিন চাই না আমার। এসব কোনো দিন আনবে না।

—আজ্ঞে, আর আনব না হুজুর।

—হুজুর? হুজুর কী? What do you mean by হুজুর? আমি হাকিম নই। জমিদার নই। স্যার, স্যার বলবে।

বিহ্বল হয়ে গেল দীনু। সে সভয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে এবার মাস্টার বললেন—এখন, উঠাও! উঠাও!

দীনু মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাস্টার বলিলেন—ঘাস। ওই ঘাসের বোঝা। উঠাও। বাইরে ফেলে দিয়ে এস! যাও!

দীনু ঘাসের বোঝা তুলে ফেলতে গেল।

মাস্টার রাস্তার দিকে সুমুখ ফিরলেন।

ফিরেই দেখলেন—কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়িয়ে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বললে– কী চাই? এখন পোস্টাফিস বন্ধ। কাল সকালে—To-morrow morning please এখন যান। তারপর দীনুকে বললেন—আরও বাইরে দীনু—আরও বাইরে ফেলো; Outside the Compound—

বলেই ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দেন।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে দীনুকে বললে—লোকটার কিছু হজম হয় না দীনু।

দীনু বললে—ওরে বাপরে সাক্ষাৎ দুর্বাসা মুনি গো।

আবার পোস্টমাস্টার বদল হয়। নতুন পোস্টমাস্টার বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন।

পোস্টাপিসেরও পরিবর্তন দেখা যায়। পোস্টাপিসের আর খড়ের চাল নাই। এ্যাজবেস্টস বা টিন হয়েছে। দেওয়ালের নতুন পলেস্তারা হয়েছে; লেটার বক্সের মুখটি এখন পিতলের, ঝকঝক করছে। নোটিশ বোর্ডটিও নূতন। যে জানালায় পোস্টেজ বিক্রী হত মনিঅর্ডার হত সে জানালাটি এখন Expanded metal দিয়ে ঘেরা হয়েছে; কাউন্টারের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেওয়ালের গায়ে পুরানো মাস্টারের টাঙানো নোটিশবোর্ডগুলির আর একটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার পরিবর্তে মোটা রকম কয়লা দিয়ে কেউ লিখে দিয়েছে—দুর্বাসা gone.

দরজা খুলে নতুন মাস্টার বেরিয়ে এলেন। পিছনে সুরেশ। বেশ নধর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, পান চিবুচ্ছেন আর হুঁকো টানছেন। এবং ঘন-ঘন ফু ফু করে করে কিছু, বোধকরি পানের কুটি জিভের ডগা থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন। বেরিয়ে এসেই পচ্ করে পানের পিক্ ফেললেন, ফু-ফু-ফু করে নিয়ে বার কয়েক হুঁকোয় টান দিলেন। দীনু তাঁকে প্রণাম করলে। মাস্টার দেওয়ালের লেখাটা অর্থাৎ 'দুর্বাসা gone' পড়ে খি-খি শব্দে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন—কী বললেন সুরেশবাবু, দীনু দুর্বাসা নাম দিয়েছিল? এ্যাঁ দীনবন্ধুর পেটে পেটে এত?—

আবার মাস্টার পরিবর্তন হয়।

এবার পোস্টাপিসের পরিবর্তনের মধ্যে সামনে একটি সুরকীঢালা রাস্তা এবং বাউণ্ডারীর চারিপাশে ফেন্সিং দেখা যায়। বাকী সব তাই আছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে একখানি টোপরওয়ালা গাড়ি নামানো। গরু দুটো ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে।

পুরানো হৃষ্টপুষ্ট পান-খেকো তামাক-খেকো মাস্টার চলে যাচ্ছেন। বারান্দায় টিনের ট্রাঙ্ক, পুরানো দড়ি দিয়ে বাঁধা চামড়ার স্যুটকেস, প্যাকিং বাক্স, বিছানার বাণ্ডিল-নামানো। সেগুলির বাঁধন পরীক্ষা

করে দেখছে পিওনেরা। পিওন এখন তুজন। ভবেশ এবং হরিহর। দীনু জিনিসগুলি গাড়িতে তুলছে। গাড়িখানি দীনুরই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন নতুন পোস্টমাস্টার নিত্যানন্দবাবু। আর দাঁড়িয়ে আছে নিত্যানন্দবাবুর পনেরো ষোলো বছরের ছেলেটি। সুন্দর-দেখতে, ভালোবাসার মতো ছেলে।

পুরানো মাস্টারের হাতে হুঁকোটি আছে। পচ্ করে পিচ্ ফেলে বার তুই থু-থু করে বললেন—চলি ভাই নিত্যানন্দবাবু good bye. কোনো ভাবনা করবেন না। জায়গা ভালো। থু-থু-থু। ওর নাম কী এরা লোক ভালো। ভবেশ হরিহর goodman সব। ভবেশ শুধু দূরের গ্রামের চিঠি এর ওর হাতে দিয়ে দেয়—বলে দিয়ে দিয়ো। মধ্যে মধ্যে কমপ্লেন হয়। থু-থু। আর হরিহর বাসায় গেলে ফিরতে দেরি করে। newly married কিনা। দ্বিতীয় পক্ষ।

হরিহর বললে—কী যে বলেন বাবু?

পুরনো মাস্টার গ্রাহ্য না করেই বলে গেলেন—আর দীনু, দীনবন্ধুর জয়জয়কার হোক। ওর ঋণে পড়তেই হবে। আমার তো শোধই হবে না।

দীনু এসে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আজ্ঞে না বাবা, উ কথা বলতে নাই, আমার অপরাধ হবে।

—হয় তো হবে দীনবন্ধু সে তোর হবে! কিন্তু আমি না বললে অপরাধ আমার হবে। উঁহু-উঁহু ভবেশ, ভেঙে যাবে বড় সাধের হুকো আমার, ওভাবে নয়;—ওটাকে বরং বিছানার মধ্যে দাও বাবা! তারপর আবার নিত্যানন্দবাবুর দিকে ফিরে বললেন—তবে একটি

বিষয়ে সাবধান। সে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বুঝেছেন! খুব সামলে থাকবেন!

সকলেই অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। দীনু শঙ্কিত বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—you mean this runer—this chap?

—Yes—This chap, এই দীনবন্ধু থু-থু-থু! খুব সামলে থাকবেন নইলে একটি মোক্ষম নাম দিয়ে দেবে আপনার। look. দেখুন—ওই দেওয়ালে। থু-থু-থু!

নিত্যানন্দ দেওয়ালের দিকে তাকালেন দেখলেন সেখানে উপরে লেখা—

দুর্বাসা gone—তারিখ 30 April 1934. তার নিচে লেখা—পাঁচুঠাকুর going-1938 15th September.

পুরানো মাস্টার ব্যাখা করে দিলেন—দুর্বাসা মুনি হলেন আমার আগের যিনি, শিবেন বাবু। আর পাঁচুঠাকুর মানে ভূতে পাওয়া মানুষ হলাম থু-থু-থু—আমি। এ-সব নাম দীনুর দেওয়া আপনাকেও একটি দেবে থু-থু-থু! মানে—

হঠাৎ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন—যাও তো বাবা খিলি-কয়েক পান নিয়ে এস তো। আর কড়া জর্দা থাকে তো খানিকটা। হ্যাঁ।

ছেলেটি চলে যেতেই মাস্টার বললেন—আমার পুত্র পরিবার নাই, কিন্তু আপনার ছেলে, সেতো ধরুন—আমারও সন্তান তুল্য। থু-থু-থু। ওর সামনে বলব কেমন করে যে মদ খাই আমি।

সন্ধ্যে বেলা কাজ-টাজ সেরে বুঝলেন—কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলা আমি মশাই কাবণ একটু করি। থু-থু একটু মানে বেশ। এখানে আবার ওই সুরেশটা জুটেছিল। মধ্যে মধ্যে থু-থু বে-এক্তার হয়ে বমি-টমি করে সে নবকে পড়ে থাকতাম। সকালবেলা এ নিজেরই ঘেন্না হত বিছানা দেখে। কী কবব নিজেই কাচতাম। কাকে বলব? তা দিনু একদিন দেখে ফেলে। থু-থু-থু। সেই দিন থেকে ও আমাকে একদিন আব ওসব নাড়তে দেয় নি। কাচত আর বলত পাঁচু ঠাকুর আমার দুধ তুলেছেন। থু-থু-থু খুব সাবধান আপনারও একটা নাম দেবে।

বলেই তাঁর মার্কামারা খি-খি-খি হাসতে লাগলেন।

সে-হাসির ছোঁয়াচ লাগল সকলকে। মায় দীনু পর্যন্ত মুখ নামিয়ে খু-খ-খুখ শব্দে হাসতে লাগল।

মাস্টার জের টেনে বললেন— বলে কী পাঁচুঠাকুর আমার দুধ তুলেছেন।

বলেই আবার হাসি—অর্থাৎ আমি পেঁচোয় পাওয়া কচি ছেলে।

এই মুহূর্তটিতেই পোস্টাপিসের ভিতর থেকে ক্লক ঘড়ি বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং।

মাস্টার চমকে উঠলেন—একি চারটে? হ্যাঁ চারটেই তো! ওরে বাপরে দশটায় যে ট্রেনরে বাবা। ও দীনু, ছেলে তোর এল কই? থু-থু-থু! ট্রেন ফেল হলে যে সারারাত থু-থু-থু স্টেশনে ভাপাতে হবেরে বাবা।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—রাস্তাও যে অনেকটা। দশ মাইলের উপর। আর তো দেরি করা উচিত নয়।

ভবেশ পিওন বললে—তোরও যেমন কাজ দীনু, ছেলে গাড়ি নিয়ে যাবে তাকে রেখে তুই গাড়ি আনলি।

দীনু চঞ্চল এবং অপ্রতিভ হয়ে উঠল। বললে- এল না গো কিছুতেই, বললে—তুমি গাড়ি নিয়ে যাও; আমার কাজ আছে খানিক—

হরিহর বললে—কাজ তো বেটার টেরী কাটা আর হৈ হুল্লোড় করা। কাজ আছে! দেখ দেখ এগিয়ে দেখ!

দীনু সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল দেখবার জন্যে; যেতে-যেতেই বললে—কী করি বলেন? সময়টা যে আমাদের ভাঁজো পরবের কিনা! প'শু থেকে পবব আবস্তু। সে আবার পরবের মাতব্বর! তারপর যেন নিজেকেই বললে—কানে কিলিয়ে বলে দিলাম। বললে—আমি গেয়িচি বলে—। ঠিক টায়েনে যাব আমি—

সে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘাড় উঁচু করে সামনের দিকে চেয়ে রইল। সামনে তার বাজারের রাস্তাটা। লোকজন চলছে, বিচিত্র নিঃশব্দ বাজারের সে-ছবি। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নিতাই নেই।

এদিক থেকে হরিহর ব্যঙ্গ করে বললে—ঠিক টায়েনে যাব; বেটার ট্যাকে যেন ঘড়ি ঝুলছে দশটা।

ইতিমধ্যে নিত্যানন্দবাবুর ছেলে পান এবং দোক্তা নিয়ে এসে দাঁড়াল। পুরানো মাস্টার সেগুলি ডিবেতে পুরতে লাগলেন, একটা পান একটু দোক্তা মুখে নিয়ে পচ্ করে পিক্ ফেলে বললেন—আঃ এ যে খাস মতিহার।

দীনু বলে উঠল—ওঃই,—ওঃই এসে যেয়েছে। দূরে বাজারের

মধ্যে একখানা সাইকেল দেখতে পেয়েছে সে। নিতাই আসছে সাইকেল চড়ে।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে ফিরে এসে গাড়ির চারিদিক দেখে নিয়ে বললে—আর কিছু পড়ে-টড়ে নাই তো বাবু?

বলতে বলতেই সদর রাস্তায় সাইকেলে চড়ে এসে হাজির হল দীনুর ছেলে নিতাই। আঠারো-উনিশ বছরের সত্যযুবক নিতাই-চরণ। মাথায় খুব বাহারের শৌখিন টেরি। গায়ে একটা বাহারের গেঞ্জি। গলায় একটা তক্তি। কব্জিতে একটা কারের বেড়। পরনে টাইট করে মালকোঁচা বেঁধে কাপড়। কানে একটা পোড়া সিগারেট। সাইকেল চালিয়ে এল সে এবং তার পিছনে চড়ে এল আর একটি সঙ্গী। সাইকেল থেকে নেমেই সাইকেলটা তার সঙ্গীর হাতে দিয়ে বললে—নাই বারোটা আত হতে আমি নিচ্ছক ফিরব। বুল্লি! তু সব ঠিক করে আকিস। অণ্ডীন কাগজের মালা যেন ভালো করে গাঁথবি। উপাড়ার চেয়ে ভালো হ' চাই। হ্যাঁ! সঙ্গী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল।

দীনু তিরস্কারের সুরেই বললে—তোর আক্কেলটা কেমন বল দিই নি? চারটে বেজে গেল। আমরা ভেবে সারা!

নিতাই উপেক্ষাভরে বললে—চারটে বাজল তো কী হল! কাজ থাকলে করব কী? আক্কেল আক্কেল! আমার নাই!

তারপর খোলা গোরু ছুটোর গলার দড়ি দু হাতে ধরে গাড়ির দিকে টেনে আনতে আনতে আপন মনে গজর-গজর করতে লাগল—কোন সময়ে কোন তান তার ঠিক নাই। প'শু থেকে ভাঁজো পরব। আজ যা বোলপুর গাড়ি নিয়ে।

দীনু বললে— লে-লে, গাড়ি তোল। মেজাজ খারাপ করিস না।

নিতাই একটা গোরুকে পিঠে হাতের গুঁতো দিয়ে বললে—বেকুব বেহদ্দা গোরু কোথাকার। ইদিকে। ইদিকে। অঁই— অঁই—। আবার দিলে গুঁতো। টেনে নিয়ে এল সে গোরু দুটোকে, গাড়িতে বাঁধলে—তারপর বললে—ল্যান—চড়ে বসেন।

পুরানো মাস্টার পচ্ করে পিচ ফেলে গাড়িতে পা দিয়ে বললেন—মিলিটারি মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা কব বাবা নিতাই! ভয় লাগছে আমার!

নিতাই হেসে ফেলে বললে—ল্যান—ল্যান চড়েন। মেজাজ খারাপ করে দেয় বাবা। দ্যাখেন ক্যানে—।

মাস্টার চড়ে বসে বললেন—চলি নিত্যানন্দবাবু, নমস্কার। ভবেশ হরিহর—

নিত্যানন্দবাবু বললেন—নমস্কার।

ভবেশ হরিহর হেঁট হয়ে নমস্কার করলে। দীনুও করলে।

নিতাই গাড়িতে উঠে গোরু দুটোর পেটে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের গুঁতো এবং পিঠে আঙুলের টিপুনি দিয়ে—নাকের ঘড়র এবং জিভে ক্যা-ক্যা শব্দ করে গাড়িটাকে চালিয়ে দিলে।

মাস্টার নিত্যানন্দবাবু বললেন—এইটিই তোমার ছেলে দীনবন্ধু ?

দীনু বললেন – আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওই একটিই ছেলে বুঝি !

দীনু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে—আজ্ঞেন তাই বটে। কটা ছেলে মরে ছেলেটা হয়েছিল—মায়ের আদরে খানিক বেয়াড়া হয়ে যেয়েছে। তার ওপরে এখানে এয়েছিল একজনা ট্যাক্সিওলা—তার

কাছে মোটর ধ' মোছা করতে লেগে অমুনি হল। বলে মোটর চালা শিখব। আর ওই বদ মেজাজ --

হরিহর বলে উঠল--শুধু ছেলের দোষ দিলে কী হবে? মায়ের দোষ দিলেই বা হবে ক্যানে? তুমি আদর কম দাও নেকি? ছেলে বললে সাইকেল লেবে—তাই দিয়ে দিলে—

—সি আজ্ঞে পুরনো সাইকেল—। তিরিশ টাকা নিয়ে দিলেন ওপরস্তার বাবু—

—খুব সস্তায় দিয়েছে ওভারসিয়ার বাবু। ওটা ফেলে দিলে কেউ নিত না। নতুনে পঁচাত্তর টাকা দাম। চড়েছে আট বছর—। বুয়েচেন বাবু, দীনুর স্বভাবই ওই। ছেলে বলতে অজ্ঞান। এই বয়সে একটা মেয়ে হয়েছে। তার নাম রেখেছে সম্মানী! ওঃ তার আবার কত! ব্যঙ্গ কবে হলেও মিষ্টভাবেই বললে সে কথাটা। ঠিক এই মুহূর্তটিতেই সদর রাস্তায় হন্তদন্ত হয়ে এল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে। থমকে দাঁড়িয়ে সে কম্পাউণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যাঃ। চলে গেল মাস্টার?

বলেই ছুটতে লাগল—মাস্টার! মাস্টার! মাস্টার হে!

ভবেশ বললে—বাঁড়ুজ্জে বোলপুর পর্যন্ত যাবে তুলে দিতে।

নিত্যানন্দবাবু বললেন—এই বুঝি সুরেশ বাঁড়ুজ্জে?

ভবেশ বললে —আজ্ঞে হ্যাঁ।

একজন রানার ডাক নিয়ে এসে ঢুকল।

হরিহর বললে—রামনগরের ডাক এসে গেল—।

মাস্টার পোস্টাপিসের ঘরের দিকে ঘুরলেন।

দীনু রাস্তার দিকে পা বাড়ালে।

হরিহর এবং ভবেশের কথায় মনে সে আঘাত পেয়েছিল। নিতাইয়ের কথায়-বার্তায় ভদ্রজনদের কাছে সে অপ্রস্তুতও হয়েছে। এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়ায় রাগ হয়েছে তার সতুর উপর। ফেরার সময় পদক্ষেপের ভঙ্গিতেই সে রাগ তার একটু পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ফিরছিল সে তাদের পাড়ার পথ ধরে।

রাঢ় বাংলার অচ্ছুত পল্লী।

মাটির দেওয়াল—খড়ের চাল—বাঁশের খুঁটি-দেওয়া পরচালা বা বারান্দাওয়ালা ছোট ছোট ঘর। উঠান রাঙা মাটি দিয়ে নিকানো। চারিপাশে কোনো পাঁচিলের ঘেরা নেই। তারই মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ।

পথের উপর উলঙ্গ ছেলেরা ঘুরছে, খেলছে। পতিত জায়গায় ছাগল চরছে।

বাড়ির উঠানে মুরগী চরছে। একপাশে গোরু বাঁধা রয়েছে। কোনো বাড়ির উঠানে কোনো মেয়ে কোনো মেয়ের উকুন বাচছে। কোনো বাড়িতে চালায় ঢেঁকিশালে মেয়েরা ধান কুটছে।

পথের ধারে পুকুরে হাঁস চরছে। পথের পাশে একটু দূরে একটি উৎসবের আয়োজন দেখা যায়। একটি গাছতলায় ভাঁজোর বেদী বাঁধা রয়েছে।

গাছের তলায় মাটির একটি বেদী। বেদীটিকে ঘিরে চারিপাশে চারটি খুঁটি। রঙীন কাগজ মোড়া।

সামনেটা চমৎকার করে নিকানো। সেখানে তরুণ-তরুণীরা ভিড় করে রয়েছে।

একটি তরুণ ঢোল বাজাচ্ছে। একজন বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে।

কোনোদিকেই দীনুর ক্ষুব্ধ মন আকৃষ্ট হল না। সে সটান এসে উঠল বাড়ির সম্মুখে।

দীনুর বাড়িতে এখন একখানি কোঠাঘর হয়েছে। পাশে সেই গোয়াল-ঘরটি। একপাশে তুটি গাই বাঁধা।

গাছতলায় দীনুর ছ-সাত বছরের মেয়ে সম্মানী খেলা করছে।

সে কাদার তাল দিয়ে ভাত-তরকারি রান্না করছে। স্ত্রী সতু দাওয়ায় বসে রয়েছে, তার সামনে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিলাসিনী তরুণী। তাকে দেখে দীনু থমকে দাঁড়াল। তারপর বললে—মেয়েটি ক্যা রে সতু ?

সতু মেয়েটিকে বললে—রেতে এসে আবার খেয়ে যাবে। এখন ওই আখহরিদের বাড়িতে থাক গা !

দীনু আবার বললে— কে বটে মেয়েটা—? কথা কানে যায় না না কি ?

মেয়েটি ঝাপটা মেরে পাশ ফিরে তাকিয়ে বললে—আমি ভাঁজো নাচতে এয়েচি। নিতাই আমার বন্ধু নোক। সে আমাকে নিয়ে এয়েচে। তুমি কে ?

—ভাঁজো নাচতে এসেছ ?

—হ্যাঁ। সিউড়ি থেকে। তুমি কে ? এমন কথা ক্যানে ?

সতু বললে—যাও মা, তুমি যাও। উ হল নিতাইয়ের বাবা !

—অ। তা এমন লাটসায়েবের মতো মেজাজ ক্যানে ?

বলেই সে যেন হেলেতুলে গা তুলিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল !

দীনু বললে—তুই—সতু—তুই এর জন্যে দায়ী !

—কী, বলছ কী ? হল কী তোমার ?

—কিছু বলি নাই। তোর ছেলে এলে বলিস ই সব চলবে না। আমার সহ্য হবে না।

বলেই আবার বলল—তারও সহ্য হবে না সহু। যা ধরমের সহ্য হয় না তা কারুর সহ্য হয় না। বলিস তাকে।

ছোট মেয়েটা খেলা ছেড়ে মা-বাপের কথান্তর শুনছিল। এবার তার বাপের কথা শেষ হতেই সে ছুটে বাপকে জড়িয়ে ধরে বললে—

-- বাবা আমি ধরমপুজো দেখতে যাব।

—ধরমপুজো এখন লয় মা। সে সেই বোশেখ মাসে। এখন পথ ছাড়। যাই।

—না। তু যে বললি। ধরম-ধরম-ধরম। আমি যাব।

—ই ধরম সে ধরমঠাকুর লয় মা। ই ধরম বড়া কঠিন মা—বড়া ভীষণ! ছাড় পথ ছাড়। চান করে এসে খেয়ে ছুটতে হবে। ডাকের দেরি হয়ে যাবে। ছাড়—সরকার বাহাদুরের ডাক!

সরকার বাহাদুরের ডাক নিয়ে দীনু চলে যায় ভাদ্র মাসের রাত্রিতে। রাত্রিটি অন্ধকার হলেও কিন্তু বর্ষণমুখর নয়। সুঁদীপুরের বটতলা। বহুদূরে শোনা যায় ভাঁজো-পরবের ঢোলের শব্দ।

আজ চারিদিকের গ্রামেই এই ভাঁজো-পরবের উৎসব লেগেছে। বন পার হয়ে প্রান্তরের মধ্যে পথে দীনু এসে পড়ল,—সেখানেও শুনল ভাঁজো-পরবের ঢোল-কাঁসীর শব্দ। এবার গ্রাম কাছে। বাজনার শব্দ স্পষ্ট। দীনু কিন্তু চলেছে তার নির্দিষ্ট গতিতে। পথে ওদিক থেকে আসছিল একদল পথিক। একজন প্রশ্ন করলে—কে?

দীনু উত্তর দিলে—ডাক। সরকার বাহাদুরের ডাক!

বাজনা বাজতে লাগল।

নবগ্রামেও বাজনা বাজছে। ভাঁজো-পরবের আসরটি জমে উঠেছে।

সেখানে ভাঁজো-তলায় একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা হেজাক বাতি।

আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্থানটি।

ভাঁজোর বেদী সাজানো সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রচুর শালুক এবং পদ্মফুল ও নানান ফুলে সাজিয়েছে।

চারিদিকে আমের শাখা এবং কাগজের ফুল দিয়ে বেড় দিয়েছে।

মেয়েপুরুষ ভিড় করে বসেছে। মেয়েরা মাথার খোঁপায় ফুল পরেছে। গলায় মালা পরেছে।

তুটি মেয়েতে গলা-ধরাধরি করে হাসছে। পুরুষেরা রঙীন গেঞ্জি পরেছে—মাথায় রঙীন গামছা বেঁধেছে। কেউ কেউ কোমরেও বেঁধেছে। কানে ফুল পরেছে। গলায় মালা।

নিতাই মাথায় জড়িয়েছে শালুক-ডাঁটির মালা। তার সঙ্গে অন্য ফুলের মালা। কানে ফুল। গলায় মালা। সে বাজাচ্ছে বাঁশি। একজন বাজাচ্ছে ঢোল।

নাচছে বাসিনী—অর্থাৎ শহর থেকে আসা সেই রঙ্গিনী মেয়েটি। সেও সেজেছে যতখানি পারে। তার কোমরে পর্যন্ত ফুলের মালা তুলিয়েছে সে।

কতকগুলি মেয়ে বসে একসঙ্গে ধুয়ো গাইছে।

আমার ভাঁজোর গলায় দোলে পঞ্চফুলের মালা—
কপালে সিঁতুর-টিপের ছায়ায় ভুবন আলা—
ও-আমার ভাঁজো সুন্দরী!

তারা থামতেই সব থামল। বাজনা বাঁশি নাচ সব।

এবার গান ধরলে নিতাই—

আমার মনের রঙের ছটা তোমায় ছিটে দিলে না।
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হায়—সে জল পাতা নিলে না।
টলোমলো টলোমলো —
হায় সখি সে পড়ে গেলো—
ও হায় চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।
মাটি হলে গলে মন – মানিক হলে গলে না।
আমার মনের রঙের ছটা--

শেষ লাইনে এসেই বাজনা বেজে উঠল দ্রুত তালে।

সঙ্গে সঙ্গে বাসিনী ওই নাচুনী মেয়েটি বেদীটিকে বেড়ে নাচতে শুরু করে দিলে।

মেয়েরা ধরে দিলে ধুয়ো। ধুয়ো শেষ হতেই বাজনার সমের সঙ্গে আবার সব স্তব্ধ।

এবার ওই বাসিনী ধরলে গান

যে রঙ তোমার মিশে গেল
নীল যমুনার জলে হে—
সে রঙ গিয়ে লেগেছে যে
লাল শালুকের ফুলে হে।
সেই শালুকে মন মানিয়ো—
সকল দুখো পাসরিয়ো—
খালি মনের সিঁদুর-কৌটা—
তাও দিও ফেলে হে—

নিত্যি নতুন ফুটবে শালুক—
বাসী ঝরে গেলে হে ॥

শেষ কলিতে এসে আবার বাজনা বাজল—বাঁশী বাজল ; মেয়েটি দ্রুততালে ঘুঙুরের শব্দে মুখর করে তুললে ভাঁজো-তলা।

এর মধ্যে একসময় ভোরের পাখিদের ডাক বেজে উঠল—কলস্বরে।

সকলে তাকাল উপরের দিকে।

দেখা গেল আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। রাত্রির অন্ধকার ছাপিয়ে ভোরের আলোর আভাস জাগছে। ঊর্ধ্ব-আকাশে আলোর ছটা বেজেছে। আবার বেজে উঠল পাখির ডাক। একটা গাছের মাথা থেকে পাখি পাখা মেলে বেরিয়ে পড়ল। আর একটা গাছ থেকে কাক এসে বসল পথের উপর।

পোস্টাপিসের সামনের যে সড়কটা সেই সড়কটার উপর। সামনে একটা বাঁক। সেই বাঁকের ওপারে শোনা গেল ঝুন-ঝুন শব্দ। বাঁকে মোড় ফিরে দেখা দিল দীনু ডাক-হরকরা। কাঁধে ডাক নিয়ে দীনু নবগ্রাম ফিরছে।

ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ তুলে দীনু এসে পোস্টাপিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকবার মুখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পোস্টাপিসের পাশে একটা ঝোঁপের আড়ালে পোস্টমাস্টার নিত্যানন্দবাবুর প্রিয়দর্শন ছেলেটি বৈঠক দিচ্ছে।

প্রিয়দর্শন ছেলেটির সুগঠিত সুন্দর দেহখানি সত্ত ব্যায়ামচর্চায় সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

কিশোর ছেলেটির পরিপুষ্ট পেশীগুলি থেকে একটি পৌরুষব্যঞ্জক মহিমা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

দীনু ডাক কাঁধে করেই এসে সেখানে দাঁড়াল। একপাশে দুটি মুগুর নামানো ছিল—সে দুটি নেড়ে দেখলে।

ছেলেটি—ছেলেটির নাম অমর—বৈঠকের মধ্যেই তাকিয়ে দেখলে দীনুকে। একটি স্মিত হাসিতে তার মুখ ভরে গেল চকিতের জন্য। তারপর আবার গম্ভীর হল সে। ব্যায়াম শেষ করে এসে দীনুর কাছে দাঁড়াল।

দীনু বললে—আপুনি রোজ করেন বাবু?

হেসে ঘাড় নেড়ে ছেলেটি সায় দিয়ে জানালে—হ্যাঁ।

দীনু বললে—ই খুব ভালো। খুব ভালো। এমন বাঁধবে শরীর!

অমর বললে—আমাকে একটু আড়াল দেখে কেউ দেখতে না পায় এমন একটা জায়গা দেখে একটা আখড়ার মতো করে দেবে দীনু?

দীনু খুব খুশী হয়ে বললে—দোব। তার আর কী? ওই পিছন দিকে—খিড়কীর পুকুরের উপর বটগাছের তলায়—দোব করে! আজই দোব।

—উঁ-হু। আরও একটু আড়াল চাই। বাবা যেন দেখতে না পান।

—ক্যানে বাবু? বাবু ই সব ভালোবাসেন না বুঝি?

—না। আজকাল ভদ্রলোকের ছেলে এ-সব করলে পুলিসে বড় হাঙ্গামা করে কি না। তাই বাবা চান না। তুমি একটা ভালো জায়গা দেখে—

ঠিক এই কথাটির পরই বাড়ির ভিতর থেকে—নিত্যানন্দবাবুর ডাক শোনা গেল।—ভবেশ, উঠেছ? ভবেশ? ভবেশ!

ভবেশ সাড়া দিল—আজ্ঞে!

অমর মুগুর দুটোকে নিয়ে দ্রুত চলে গেল বাড়িটাকে বেড় দিয়ে। যাবার সময় বলে গেল—বাবাকে বোলো না। কেমন?

মাস্টার বললেন বাড়ির ভিতরে—হরিহর আসে নি? ডাক? ডাক আসে নি?

দীনু ফিরল। সেও একটু চকিত হয়েছে। সে এসে ডাকঘরের বারান্দার উপব ডাকটা নামিয়ে ডাকলে—বাবু!

এদিকে সদর রাস্তা থেকে কম্পাউণ্ডে এসে ঢুকল সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বাঁড়ুজ্জে বললে—হ্যাঁ রে দীনু, শুনে এলি কিছু বোলপুরে? যুদ্ধ লেগেছে আবার? হিটলার লাগিয়ে দিয়েছে?

পোস্টাপিসের দরজা খুলে বের হলেন নিত্যানন্দবাবু।—সুরেশ-বাবু! এত'সকালে?

—যুদ্ধ। যুদ্ধ লেগেছে শুনছি! সারারাত কাল ঘুমুই নি।

—কাগজ? হাসলেন নিত্যানন্দবাবু।

দীনু ডাক নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দীনু ফিরল তাদের পাড়ার পথে। তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে। সাতটা বেজে গেছে। পাড়াটা আজ নিঝুম। ভোর পর্যন্ত ভাঁজো গান করে সকলে শুয়েছে—ঘুম ভাঙে নি। পথের ছড়ানো ফুলগুলি পড়ে আছে।

অদূরে ভাঁজো-তলা।

সেখানটাও জনশূন্য। দীনু একবার তাকিয়ে দেখলে। এখনও হেজাকটা জ্বলছে।

ভাঁজোর বেদীর সাজসজ্জা ভাঙা বাসরের মতো বিশৃঙ্খল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল দুখানা পা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে। দীনু সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখলে গাছের ওপাশে যাব পা বেরিয়ে আছে সে নিতাই-ই বটে। নিতাই একা নয়, আরও একজন রয়েছে! পরক্ষণেই শুনতে পেলে—নারী কণ্ঠে কেউ বলছে—

—বলেছি তো। গানেই তো জবাব দিয়েছি হে।

বলেই অতি মৃদু স্বরে গেয়ে দিল—নিতি নতুন ফোটে শালুক বাসী ঝরে গেলে হে! বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে বাসিনী। বাসিনী এবং নিতাই গাছতলায় গত রাত্রির সেই সাজেই গাছের শিকড়ে মাথা দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

বাসিনী আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

নিতাই কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে।

নিতাই বললে—না। নিত্যি নতুন শালুক আমার চাই না। আমি তোকে চাই।

—লারব ভাই।

—ক্যানে?

—তোমাদের যা ঘর-দুয়োর—থাকবার ছিরি—ই কষ্টে থাকতে আমি লারব!

—আমি পরাণ পণ করে খাটব বাসিনী!

—কী? ওই তো বাবা করে ডাক-হরকরাগিরি—তুমি কি করবে চৌকিদারি? না মুটেগিরি?

বাসিনীর হাতটা ধরে নিতাই বললে—আমি মোটর চালানো শিখেছি, লাইসেন্স করাব—ডেরাইবার হব আমি—

—বেশ তখন যেয়ো আমার কাছে।

দীনু আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে চলে গেল।

বাড়ি গিয়ে দেখলে সতু এবং মেয়ে সম্মানী তখনও ঘুমুচ্ছে।

সে মাথায় হাত দিয়ে দাওয়াতে বসল।

কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে নিজের কপালে দুটো চাপড় মেরে বললে—এই! এই! এই! তারপর আবার কপালে হাত দিয়ে ঝিমোতে লাগল।

আবার মুখ তুলে ঘুমন্ত সতুর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে ডাকলে—শুনছিস। এই! এই!

সতু পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললে—ঘরের ভেতরে সব ঠিক কঁরে একেছি নিয়ে খাও ক্যানে!

—খাও ক্যানে? পিণ্ডি খাবার লেগেই আমি হা-হা করছি বটে।

—তবে কী? আমি এখন উঠতে লারব! সতুর শেষ কথাগুলি জড়িয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

দীনু নিষ্ঠুর ক্রোধে ঘুরে চুলের মুঠো ধরতে গেল; গিয়েও হঠাৎ ক্ষান্ত হল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তোকে দোষ দিয়ে মেরেধরেই লাভ কী? যার যা মতি; যার যা নেকন!

বলে ঘরে ঢুকে ঢেকে-রাখা মদের ভাঁড় থেকে খানিকটা মদ খেয়ে, থালায় রাখা মুড়ি মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতেই গামছায় সেগুলি ঢেলে নিয়ে মাথাল মাথায় দিয়ে কাস্তে হাতে বেরিয়ে এল। গোরুগুলি শুধু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—চললাম

তোদের লেগে ঘাস আনতে! শুধুমুখে দাঁড়িয়ে দ্যাছিস! কী করব বল—তোদের কপাল আর আমার কম্মফল।

চলে গেল সে মাঠে। সেখান থেকে বোঝা বেঁধে ঘাস কেটে নিয়ে ফিরবার সময় মাঠের ধারের আমবাগানে একটি গাছতলায় বোঝা ফেলে সে জিরুতে বসল। গামছাটা দিয়ে মুখ মুছে ঘুরিয়ে বাতাস করতে লাগল। অনেক পুবনো আমবাগান। ছায়া সেখানে নিস্তবঙ্গ। দু-চারটি পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। দু-চারটি পাতা খসে পড়ছে। তা ছাড়া একটানা উঠছে ঝিঁঝির ডাক! মধ্যে মধ্যে কাঠবিড়ালীরা ছুটোছুটি করছে।

দীনু গাছে ঠেস দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। আপন মনেই বললে—চলে যাব আমি বিবাগী হয়ে--মরুক গা সব—আমি আর এমন কবে—

হঠাৎ বাগানের ওদিকে প্রান্ত থেকে বাইসিক্লের ঘণ্টাব ঝুন-ঝুন শব্দ শুনে চকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

চারিদিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে—কে? এ আমবাগানে সাইকেল নিয়ে—কে?

হঠাৎ তার নজরে পড়ল—দূরে একটি গাছের গায়ে পায়ের ভর দিয়ে চেপে বসে রয়েছে পোস্ট মাস্টার বাবুর ছেলে অমর। তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আর একটি সমবয়সী ছেলে। দীনু বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

ওদিকে হ্যাণ্ডেল-ধরা ছেলেটি আবার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেল্ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল; অমর গাছের তলায় তলায় মাথা গুঁড়ি করে সাইকেল চালিয়ে এদিক দিয়ে এগিয়ে আসবার পথে

দীনুকে দেখে আবার একটা গাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হেসে বললে—দীনু!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘাস কাটতে এসেছিলাম গোরুর জন্যে। কিন্তু আপনি এখানে বাবু! বিস্ময়ের তার আর অবধি ছিল না। কারণ এই বাগানটাকে ভয়ের জায়গা বলে সকলে এড়িয়ে চলে।

অমর হেসে বললে—শুনলাম না কি এই বাগানে তোমাদের ভূত আছে? দিনের বেলাতেও কেউ আসে না! তাই দেখতে এসে-ছিলাম। কিন্তু তুমি এই সারারাত ডাক বয়ে এসে এখন আবার কী করতে এসেছ?

দীনু বললে—কী করব বলেন? গোরু কটা আছে, অবোলা জীব। ভগবতী! ভাদ্দ মাস। খড় নাই। কী খাবে?

—ও। ওই ঘাস কেটেছ বুঝি? ওঃ অনেক কেটেছ!

—আপুনি কিন্তু ই বাগানের সেই ওঁদের কথা নিয়ে হাসি-তামাসা করবেন না বাবু! ঠাঁইটা সত্যিই বড় খারাপ। আমরা এই বাইরে বাইরে যাই আসি।

—কেন? ভূত মেরে ফেলে? কিন্তু ভূত যে আমি মানি না দীনু! আচ্ছা চলি। বলেই সে সাইকেল চালিয়ে খানিকটা গিয়ে আবার ফিরল, দীনু তখনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরে এসে বললে—তুমি যেন বাবাকে এ-কথা বোলো না দীনু। কেমন? ভারি রাগ করবেন তিনি।

--কিন্তু তিনি যদি শুধোন বাবু? যদি শুধোন—হারে দীনু, তোর সঙ্গে ওই গলায় দড়ের আমবাগানে আমার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তাহলে?

অমর তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে—মিথ্যে কথা বলতে পারবে না? আচ্ছা, বাবা না জিজ্ঞাসা করলে তুমি বোলো না। কেমন? তাতে তো মিথ্যে বলা হবে না।

—আজ্ঞে বেশ। তা বলব না।

অমর বললে—তা হলেই হবে। একটু চুপ কবে থেকে বললে—জান দীনু, খুব ছেলেবেলায় আমাব মা মবে যান। বাবাই আমাকে মানুষ কবেছেম। সেইজন্যে আমাব জন্যে ভারি ভয়। একটুতেই দুঃখ পান!

দীনু বেদনা অনুভব করলে। সঙ্গে সঙ্গে ভারি ভালো লাগল তাব এই ছেলেটিব বাপেব প্রতি ভালোবাসা। সে তাড়াতাড়ি বললে—না—না—বাবু, আমি নিজে থেকে কখনো বলব না। আর—আর বাবু যদি শুধোনও তবে চুপ কবে থাকব। বুয়েচেন! পেড়াপীড়ি করলে বলব—কবে বলেন দিকি? কোন বাগান বলেন তো? এক রকম কবে এড়িয়ে যাব। আব বলব—না—না বাবু, আপনি দুঃখ পান সেই কাজ দাদাবাবু কখুনও কববেন না। সে ছেলেই নয়!

—আচ্ছা—আচ্ছা। আমি চলি!

বলে অমর চলে গেল।

দীনু তার গমনপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাসেব বোঝাটা তুলতে উদ্যত হল। অমর যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখে আবার ফিরল। নামল সাইকেল থেকে; বললে—তুলে দেব?

বলেই সে ধরলে বোঝাটার একটা প্রান্ত এবং অবলীলাক্রমে তুলে দিলে।

বিস্মিত হয়ে দীনু বললে—আপনার তো খুব 'গায়ের জোর দাদাবাবু!

—খুব? হেসে উঠল অমর। তারপর সে আবার সাইকেল চড়ে চলে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে রাগে ঘৃণায় যেন পাথর হয়ে গেল।

বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে সেই রঙ্গিনী মেয়েটা বাসিনী প্রায় তুফান তুলেছে। সতু প্রায় হতবাক হয়ে বসে আছে। পাড়াপড়শীরা জমেছে।

বাসিনী বলছে—তোমাদের ছেলে এনেছে আমাকে। পাঁচ টাকা নগদ দেবার কথা। সে না দিলে তোমাদিগকে দিতে হবে। আর চড় মেরেছে আমাকে। তার দরুন দশটাকা দিতে হবে আমাকে। লইলে আমি থানাতে যাব। ডায়রী করে কোর্টে গিয়ে নালিশ করব! আমাকে চড়!

সতু বললে—বেশ সি আসুক। তুমি বস।

বাসিনী বললে—বসব? না। টাকা দাও আমার। আমি চলে যাব এখুনি।

দীনু এতক্ষণে মাথার বোঝাটা ফেলে সামনে এগিয়ে এল।—কী, হয়েছে কী? তুমি চেঁচাও ক্যানে গো বাছা?

দীনুর মেয়ে সম্মানী ছুটে এসে ভয়ার্তভাবে বললে—থানায় যাব বলছে বাবা।

—যাক থানায়। থানায় কোর্টে লাটসাহেবের কাছে যেখানে যাবে যাক। চলে যাও তুমি। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে চেল্লায়ো না।

—রাস্তায় রাস্তায় চেল্লাতে চেল্লাতে যাব আমি। নালিশ করে

জেলে দোব। ডাকহরকরাকে চামচিকে সরকারী চাকরে বলেছি— তাতেই আমার বাপ-সোহাগে ছেলের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। আমার গালে ঠাস করে চড়!—আচ্ছা—।

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে যাবার জন্যে ফিরল।

দীনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—দাঁড়াও।

মেয়েটা ঘুরল- কী? সেও যেন ফনা তুলে দাঁড়াল।

—তুমি ক্যানে তা বললে? ডাকহরকরা চামচিকে সরকারী চাকরে?

—তোমার ছেলের আমাকে বিয়ে করবার সাধ ক্যানে? আমি বললাম—আমাকে পুষবে ক্যামনে? তা বলে—ডেরাইবারীর লাইসেন লেবে, মটর চালাবে। আমি বললাম—লাইসেন করাতে টাকা লাগবে যে শ দরুনে। যোগাড় কর! তা বলে বাবার কাছে আদায় করব। তাতেই ঠাট্টা করে বলেছিলাম; তা আমার গালে ঠাস করে চড়! আমি নালিশ করব।

দীনু বললে—নিযে যাও তোমার টাকা! দাঁড়াও; এনে দিচ্ছি আমি!

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

এসে হাজির হল সে-গ্রামের প্রধান ব্যক্তি—তার পূর্ব মালিকের বাড়িতে। যিনি তাকে লাগিয়েছিলেন ডাকহরকরার কাছে।

সেখানে তখন জমাট মজলিস।

প্রধান ব্যক্তি তামাক খাচ্ছেন; সুরেশ বাঁড়ুজ্জে যুদ্ধের সংবাদ পড়ছে। আরও দু তিন জন বসে আছে।

সুরেশ বলছে—এ যা লাগল—তা বুঝতাছ না তোমরা।

একজন বললে—তুমি পারছ ?

—নিশ্চয়; কুরুক্ষেত্র! এবার কৌরব কুল মানে—আমাদের এঁরা—বুয়েছ—হুঁহুঁ—হিটলার ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বে। দেখনা কী লিখছে—বারুদ স্তূপে অগ্নি সংযোগ। একবারে বিস্ফোরণ। দেখ না কী হয়। ধাঁ ধাঁ করে চলে আসবে বাবা—কুইক মার্চ, হেঁটে নয়—এবার যান্ত্রিক বাহিনী। গড়গড় করে।

দীনু এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

কর্তা বললেন—ধানের দর আজই নাকি আট আনা চড়ে গেল ?

—আট আনা ? দশ আনা। সাড়ে দশ আনা। লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ছে। একজন বললেন।

অন্যজন বললেন—যে যেমন পারছে। বুঝছেন না! কোমর বেঁধে বাঁধাই করতে লেগেছে।

দীনু বললে—বাবু!

কর্তা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন—দীনু! কী রে? এমন সময় ? এখন তো মাইনের সময় নয় ? গাড়ি ভাড়ার টাকা জমিয়েছিস বুঝি ?

অন্য সকলকে এর পর বললেন—দীনু আমাদের ভারি সঞ্চয়ী। মাইনের টাকাটি পোস্টাপিসে পেলেই যাবার পথে অৰ্দ্ধেক টাকা আমার কাছে জমা দিয়ে যায়।

সুরেশ বললে—এইবার আরও জমবে। বুয়েচেন না—মজা তো চাকরেদের। মাইনে বাড়বে এবার তার উপর যে ইনকেলাপের ঠেলা।

একজন বললে—ইনকেলাপ ? যুদ্ধের সময় ট্যা ফো করলে বন্দুক চালিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে! ইনকেলাপ!

কর্তা বললেন—তোমরা থামো হে! লোকটা দাঁড়িয়ে আছে—কি বলছে শুনতে দাও।

দীনু বললে—আজ্ঞে বাবু, কটা টাকার প্রয়োজন আছে। পনেরটা টাকা লোব। ভারি দরকার!

— নিয়ে যা। সরকার, দীনুর জমা টাকা থেকে পনেরোটা টাকা দাও তো!

বাড়ি এসে টাকা পনেরোটা বাসিনীর হাতে দিয়ে দিলে।

বাসিনী তখন গাছতলায় বসে ছিল স্তব্ধ হয়ে। কৌতূহলী প্রতিবেশিনী প্রতিবেশীরা তখন অধিকাংশই চলে গেছে।

টাকাটা দিয়ে বললে—যাও!

বাসিনী টাকাটা নিয়ে একবার ঘুরে তাকিয়ে সকলকে দেখে নিয়ে তার অভ্যস্ত চলনে হেলে-দুলে চলে গেল।

দীনু সতুকে বললে—সি কোথা? সি শুয়োরের বাচ্চা?

—জানি না। কোথা গিয়েছে—আমাকে বলে গিয়েছে?

—যা, উয়োর সঙ্গী-দিগে বল গা, ডেকে দেবে। বল গা আমি ডাকছি!

—সি আসবে যখন মন। তুমি চানটান কর; ঠাণ্ডামাণ্ডা হও! মাথা গরম কোরো না—লায়েক ছেলের ওপর। উ আমার ভারি রবিমানী?

—রবিমানী? শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার! শুয়োরের বাচ্চার আবার রবিমান! (গোঁয়ারতুমি) গঁরতুমি—শুয়োরের বাচ্চার থাকে গঁরতুমি! এক নম্বরের গঁর কাঁহাকা। অ্যাঁ—মেয়েটাকে চড় মেরে দিয়েছে?

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ শুনছিল কথা। সে এবার এসে বাপের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলে—এই বাবা!

দীনু গ্রাহ্য না-করে সতুকে বললে—ডাক ডাক, বলব না কিছু; ডাক। শুনছিস!

মেয়েটা উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলে—এই! এবার হাত দিয়ে খোঁচা দিলে।

দীনু বললে—দিব্যি করে বলছি, আমি কিছু বলব না। ডাক। বাবাকে চামচিকে বলায় বেটার আগ! বলিহার রে বেটা শুয়ারের বাচ্চা। ডাক। তার কণ্ঠস্বরে খুশীর সুর উপচে পড়ল। সতু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেয়েটা এবার বিড়ালীর মতো পিঠে খামচে দিয়ে ডাকলে—এই বাবা! শুনতে পেচিস না কি?

দীনু বললে—অ-হ-হ। খামচাস ক্যানে—? অ্যাঁ!

মেয়েটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাপের পানে।

দীনু বললে—তু কাঠবিড়ালি না কি? নখের ধার দেখ!

মেয়েটা বললে—দাদাকে তু শুয়োরের বাচ্চা বলছিস ক্যানে?

—বলবে না? তোর দাদা নিশ্চয় শুয়োরের বাচ্চা!

—দাদা শুয়োরের বাচ্চা তো—তু কী? তুই তো দাদার বাবা!

—কী বললি? সকৌতুকে সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দীনু বললে—কি বললি? অ্যাঁ?—বলে হা-হা শব্দে উচ্চ হাসিতে যেন ভেঙে পড়ল।

ঠিক এই সময়টাতেই নিতাই মত্ত অবস্থাতেই এসে বাপের পায়ে হাত দিয়ে বার বার প্রণাম করে বললে—পেনাম, পেনাম। তুমি

আমার বাবা। !তোমাকে পেনাম! আর কখুনও এমন কাজ কবব না।

—ওঠ, ওঠ। পেনাম করতে হবে না, ওঠ!

নিতাই বললে—উ তোমাকে চামচিকে বললে ক্যানে? আমি মেরে দেলাম চড়!

—আমি তাব টাকা দিয়ে দিয়েছি। খুশী হয়ে দিয়েছি। কিন্তু খববদাব—আব উসব মেয়েব ছ্যঁা (ছায়া) মাড়াবি না। ও সব মেয়ে পাপ। সাক্ষাৎ পাপ! তুনিয়ায় সব সয়, পাপ সয় না। পাপ বাপকে ছেড়ে কথা কয় না।

—দিব্যি কবছি। ভগমানেব দিব্যি। মা-কালীব দিব্যি।

দীনু ছেলেকে ধবে দাওয়ায় বসিয়ে প্রায় জোব কবে শুইয়ে দিয়ে বললে—শো। এখন ঘুমো। সারা দিন ঘুমো। সত্থ, দে দিই নি একখানা পাখা। বলে মাথাব চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সত্থ পাখা এনে দিতেই পাখা দিয়ে বাতাস কবতে করতে বললে—খুব ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দোব তোব। লক্ষ্মীব মতো মেয়ে। মদটদ ছাড়। মন পাতিয়ে কাজকম্ম কর—

নিতাই বললে—কালীর দিব্যি, ভগমানের দিব্যি—

দীনু পাখাখানা রেখে তুই হাত জোড় কবে প্রণাম জানালে। সম্মানী পরিত্যক্ত পাখাখানা নিয়ে বাতাস দিতে লাগল।

দীনু তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখে ঠেকিয়ে কাঠবিড়ালির ডাক অনুকরণ করে ডেকে উঠল।

—চিক-চিক-চিক-চিক!

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের গায়ে সস্নেহে খামচে দিলে।

মেয়েটা অভিযোগের সুরে বললে--অঁ-ই! অ-মা—।

দীনু বললে—হুঁ—আমি এখন কাঠবিড়ালির বাবা! বড় কাঠবিড়ালি যে! বলেই আবার ডাকলে—চিক-চিক-চিক-চিক! হুঁ-হুঁ!

মেয়েটা বললে—যাঃ।

দীনু বললে—শুয়ারের বাচ্চা আচ্ছা হ্যায়। বদমাস মেয়েটাকে ভাগায়া হ্যায়। মা-কালীকে দিব্যি কিয়া হ্যায়! জয় মা-কালী। দে সতু ত্যাল দে, চান করে আসি!

সুরে গাইতে গাইতে সে বেরিয়ে গেল--মনো চাহে যাও হে তুমি--আমি যাইব না; কেলি কদমতলায় বৃন্দে গো!

সেই রাত্রেই সে ডাক নিয়ে গিয়ে বোলপুরে রেল প্লাটফর্মে, মেল-ব্যাগগুলি নামিয়ে একটা আলোর থামের নিচে এসে বসল, ওই গানটিই গাইতে গাইতে এল গুনগুনিয়ে—

মনো চাহে যাও হে তুমি--আমি যাইব না,
কেলি কদমতলায় বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই নিবে আমি চাইব না—
কালো মানিক কালায়—বৃন্দে গো!

সঙ্গী অন্য রানারটি আগে থেকেই এসে বসে ছিল। আপন মনে খোলামকুচি দিয়ে দাগ টেনে ঘর আঁকছিল—সে মুখ তুলে হেসে বললে—আজ ভারি খুশী দীনু ভাই!, গান গাইছ লাগছে?

--সি আমলের ভাঁজো গান মনে পড়ে যেল দাদা! ওঃ কী গানই ছেল! সেই উবেলা থেকে গো!

—তা বটে। তা হবে নাকি একদান বাঘবন্দী? ঘর আমি এঁকে একেছি।

—তা বস! তার আগে ভাই একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে কিন্তুক।

সঙ্গী খোলামকুচির গুটি সাজাতে সাজাতে বললে -বল! কথা কী বল!

—একটি ভালো কন্যে দেখে দিতে হবে। ভা—লো কন্যে। বুয়েচ। বটাটার আমি বিয়ে দোব!

—কন্যে? তা তোমার রবাব কি? মেলাই কন্যে!

- মেলাই তো বটে। কিন্তু সো-ন্দ-র কন্যে চাই। আমার বেটার আবার নাক-খানিক উঁচু! বুয়েচ!

—সো—ন্দো—র কন্যে! তোমার বেটার নাক-খানিক উঁচু! ভালো করে ভেবে দেখতে হয়! সো-ন্দ-র কন্যে!

—হ্যাঁ—ভাঁজোতে নাচতে-মাচতে পারে। বেশ রহলা-কহলা—বুয়েছ মানে—চোখোল-মুখোল মেয়ে চাই; বেটার উঁচু নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরুতে পারা চাই। তা-পরেতে একটা-দুটো বেটাবিটি হলে তখন আমি নিশ্চিন্তি; তখন ঘোড়ার মুখে কাঁটা লাগাম!

—হুঁ। ব—সে বসে তখন মজা দেখ ক্যানে!

দীনু বললে—শুধু মজা দেখা? তা দিগে উস্কে দিয়ে মজা দেখব! হুঁ। হুঁ! লাও—এই চাললাম আমি। আমার ছাগল! চালো।

—এই এক কাট!

মুসাফেরখান্নায় তখন স্টল-ওয়ালা হাঁকছে—চা গ্রোম।

একটা ফেরিওয়ালা হাঁকছে—পান বিড়ি।

যাত্রীরা শুয়ে আছে।

ওদিকে ঘন্টা পড়ে গেল—ঢনো-ঢনো-ঢনো-ঢনো।

মেলট্রেন আসছে।

প্লাটফর্মের উপর ওই ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে ইঞ্জিনের সার্চলাইট পড়েছে।

দীনু এবং অন্য-রানার দুজনেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অন্য রানারটি হাত তুলে আড়ামোড়া ছেড়ে বললে—উঠো মুসাফের বাঁধো গাঁঠেরি—চলো এখন— পাঁচ কোশ পথ—ঝুন ঝুন-ঝুন-ঝুন—

ঝুন ঝুন-ঝুন-ঝু — ঘণ্টার শব্দ তুলে দীনু ভোরবেলা এসে ঢুকল— নবগ্রামের ভিতর।

একটা কুকুর উঠল ঘেউ ঘেউ করে।

দীনু বললে—যা মলো। রোজ দেখেও চেনো না? ওরে বাবা, সরকারী ডাক! ভাগো বেকুব কাঁহাকা!

সামনেই একটা চায়ের দোকানের উনোনটা রাস্তার উপর ধোঁয়াচ্ছে।

একজন পুলিস কর্মচারী বাইসিক্ল চড়ে তাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

একটু পরেই ইস্কুল। পাশে বোর্ডিং।

সেখানে দুজন কনেস্টবল দাঁড়িয়ে।

দীনু বিস্মিত হয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল! এত ভোরে এখানে পুলিস! আবার চলতে লাগল!

একটু এগিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকাল। আবার চলল।

পোস্টাপিসের সামনে এসে তার বিস্ময় উঠল চরমে।

পোস্টাপিসের সামনে কজন কনেস্টবল। কোয়ার্টারের দরজাতেও একজন।

বারান্দায় নিত্যানন্দবাবু দুজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন।

পিওন ভবেশ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

সদর রাস্তায় ভয়ার্ত মুখে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

সুরেশ একটু এগিয়ে এসে—মৃদুস্বরে বললে--অ দীনু, মাস্টারের ছেলেকে ধরতে এসেছে পুলিসে রে।

দীনুও মৃদুস্বরে সবিস্ময়ে বললে—অমরবাবুকে ?

—হ্যাঁ রে। সাংঘাতিক ছেলে। বোমা পিস্তল— স্বদেশী !

---না বাবু। মিছে কথা !

—মিছে কথা নয় রে ; নইলে সে পালাবে কেন ?

—পালিয়েছে ?

—হ্যাঁ ! হ্যাঁ। পাখি রেতেই ফুরুত ধা !

ওদের কথায় ছেদ পড়ল বুটের শব্দে। বুটের শব্দ উঠতেই ওরা চুপ করল। ওদের সামনে দিয়ে কনেস্টবলেরা চলে গেল। পিছনে অফিসারেরা।

একজন অফিসার থমকে দাঁড়ালো।

--বোলপুর থেকে ডাক আনছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুষ্ককণ্ঠে দীনু উত্তর দিলে।

— মাস্টারবাবুর ছেলেকে পথে দেখেছ ? বাইসিক্লে চড়ে—

-- আজ্ঞে না হুজুর।

—হুঁ। যাও, ডাক নিয়ে ভেতরে যাও!

চলে গেলেন তিনি। দীনু ডাক নিয়ে ভিতরে গিয়ে বারান্দায় ডাক নামালে। মাস্টার তখন ঘরের ভিতর মাথা নিচু করে ঢুকছেন।

পিওন বললে—ঘরে—বাইরে আর ডাক নামাবি না।

দীনু মৃদুস্বরে বললে—অমর বাবুকে ওরা –

পিওন বললে—হ্যাঁ, চেঁচাস না!

বাড়ি গিয়েও দীনু চুপ করে বসে ছিল। স্তব্ধ হয়ে।

মনটা তার খারাপ হয়ে গেছে। অমরবাবুর মতন ছেলে- - !

স্ত্রী সত্থ গোরুগুলিকে খাবার দিচ্ছিল। সম্মানী একটা বাছুরকে দড়ি ধরে টানছিল। গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। দীনু বসতেই সম্মানী ছবি চিঠি ছবি চিঠি—বলে ছুটে এসে বাপের হাত থেকে দুখানা রঙীন খাম টেনে নিয়ে শুঁকে বললে—কী সোন্দর সুবাস, দেখ মা!

সত্থ মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে এইভাবে স্তব্ধ দেখে বললে—এমন করে বসলা যি গো? কী হল?

দীনু উত্তর দিলে না।

সত্থ বললে—জ্বর-টর হইছে না কি গো।

মেয়েটা বললে—এই বাবা আ কাড়্ ক্যানে! বাবা!

দীনু বললে—চ্যাঁচাস না রে চ্যাঁচাস না। পরানটো আমার ছাড়া-ছাড়া করছে। চ্যাঁচাস না।

ঠিক এই সময়েই বাড়ি ঢুকল নিতাই। আজ তার চেহারা দিব্য ফিটফাট। বাপকে দেখে বললে—আইচ ফিরে? কাণ্ড শুনেছ? তোমার মাস্টারবাবুর ছেলের?

—শুনেছি! তাই বলছেলাম পরানটো আমার ছাড়ো-ছাড়ো করছে।

—ওই গলায় দড়ের আমবাগানটো একবারে তছনছ করছে পুলিসে। মাটি খুঁড়ছে। বলে বোমা-বন্দুক লুকোনো আছে।

দীনু চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল তার আমবাগানে অমরের ঘোরাঘুরির কথা। ছেলের মুখের দিকে একবার চকিতভাবে তাকিয়ে সে মাথা নিচু করলে।

সতু বললে—তা তু যে গেলি ঘাস কেটে আনতে, ঘাস কই?—

নিতাই বললে—উ আমি পারব না। বাবা—যে ভাতুরে গরম আর সুঙসুঙি! আব জোঁক কী? এই বড় বড়!

দীনু বললে—দে, আমার কেদে দে সতু। আর মুড়ির গামছা।

নিতাই বললে—যেতে হবে না। সি আমি বলে দিয়েছি, অতন দিয়ে যাবে।

সতু বললে—অতন দিয়ে যাবে, পয়সা লেবে না?

দীনু উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। মদের ভাঁড়, কাস্তে, গামছা-বাঁধা মুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল।

নিতাই তখন বলছে—সি টাকা আমি দোব।

—তু দিবি?

—হুঁ তো কি? দোব কি—একটো টাকা দিয়ে দিয়েছি আমি।

—টাকা তু কোথা পেলি?

—আজারা মানিক কোথা পায়?

সতু বললে—টাকা উ কার কাছে ধার করেছে। শুধোও তুমি

ওকে। সেই ভোরে উঠে কোথা যেয়েছিল। যখন ফিরল তখন—ওর কোঁচড়ে টাকা ছিল!

দীনু বললে—নিতাই! শাসনের সুরেই সে বললে।

নিতাই বললে—অই তুমি চোখ আঙাতে লাগলে দেখি! বেশ করেছি—আমি ধার করেছি। আমি ওজকার করে শোধ দোব।

—হুঁ। ভাঁজোর সেই মেয়েটাকে যেমন ওজকার করে দিয়েছিলি টাকা—তেমনি করে দিবি!

—দোব! দোব! দোব! মটর ডেরাইবারির লাইসেন্ লি—তারপর দিই কি না দেখো! লাইসেন করাতে আমার শ তুই-আড়াই টাকা লাগবে—তুমি দাও। দেখো আমি কত ওজকার করি!

—টাকা আমার নাই নিতাই। মটর ডেরাইবারির বাসনা তু ছাড়!

—সি আমি ছাড়ব না। টাকা তুমি দাও চাই নাই দাও! বলতে বলতেই সে বেরিয়ে চলে গেল।

সতু ব্যাকুলভাবে ডাকলে—নেতাই। অ—নেতাই!

সম্মানী ছুটে খানিকটা গিয়ে ডাকলে—দাদা—!

দীনু সতুকে গম্ভীর স্বরে বাধা দিয়ে বললে—খবরদার ডাকবি না! খবরদার। যেখানে মন যাক উ!

সতু বললে—তা উ যদি ডেরাইবার হয়—তো টাকা দাও ক্যানে তুমি। একটো ছেলে—

—একটো ছেলের জন্যে সতু—মাসে মাসে দশ টাকা বারোটাকা করে বাবুর কাছে জমিয়ে বছরে বছরে দশ কাঠা পাঁচ কাঠা করে পাঁচ বিঘের ওপর জমি করেছি। কোঠাঘর করেছি—ছেলে-বউ শোবে। ডেরাইবার হলে সে জমি আমার ঠায় শুকিয়ে পড়ে

থাকবে—চাষ হবে না। লইলে বেচে খেয়ে দেবে উ। ডেরাইবার আমি দেখেছি। ওতে শুধু ধরম লয় সত্থ, জাতসুদ্ধ যাবে। আর টাকাও আমার নাই। জমি কিনে পঞ্চাশ টাকা ছিল—তা থেকে পনের টাকা এনে সেই রঙ্গিণীকে দিয়েছি। টাকা আমার নাই। থাকলেও—

কথাটার উপরেই উঁচু গলায় কথা বলে প্রবেশ করল ভবেশ পিওন।

—দীনু, অ দীনু!

—পেওনবাবু! হঠাৎ—? বাবুর ছেলে?

পিওন ভবেশ চিঠির তাড়া হাতে ব্যাগ কাঁধে ডাক বিলি করতে বেরিয়েছে। পথে দীনুর বাড়িতে এসেছে। বললে—সে তো পালিয়েছে। ধরা পড়ে না পড়ে, তার কপাল। এখন মুশকিল হয়েছে দীনু, মাস্টারবাবু বড় মুষড়ে গিয়েছেন।

—আহা—তা—আর যাবেন না?

—আজ হাটের দিন ছিল—হাট হয় নাই। আমার বিটি আছে ভিন গাঁয়ে। হরিহরের জ্বর। তু বাবা তোর ঘরে লাউ-টাউ কি কুমড়ো-টুমড়ো থাকে তো নিয়ে যা। আর মাছ পো খানেক। আর তুই বাবা আজ ওখানেই থাকিস। বুঝেছিস? সুরেশ বাঁড়ুজ্জে আছে, তুই ও থাকিস।

—আজ্ঞে বেশ! এখুনি চললাম আমি।

দীনু পোস্টাপিসে এল একটি লাউ, কিছু বেগুন, কিছু লাউয়ের শাক এবং মাছের খাড়ুই হাতে করে। বেলা প্রায় বারোটা।

বাইরের বারান্দায় নিত্যানন্দবাবু এবং সুরেশ বসে আছে। সুরেশের হাতে কাগজ।

মাস্টার বলছেন—ও ছেলের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি, বুঝেছেন বাঁড়ুজ্জে।

সুরেশ বললে—না—না—না। ও কী বলেছেন? এখন তো এ-সব ঘরে-ঘরে গো। রায়বাহাদুরের ছেলে বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে! পালিয়েছে আবার দু দিন পরে ফিরবে। তখন ধরে-পেড়ে-

—উঁহু! এ-ছেলেদের জাত আলাদা বাঁড়ুজ্জে। আমার ছেলে বলে বলছি না—

ঠিক এই মুহূর্তেই দীনু জিনিসগুলি নিয়ে দাঁড়াল।

মাস্টার কথায় ছেদ টেনে বললেন—এ-সব আবার কী আনলি রে? ভবেশ বলে গেল বুঝি? কেন আনলি বাবা? দরকার ছিল না। কে রাঁধবে বল? আমার আর খেতে ইচ্ছে নাই।

বাঁড়ুজ্জে বললে—আমি রাঁধব মাস্টার, আমি রাঁধব। যা—যা দীনু, বাসার ভেতর রাখ গিয়ে। আর উনোন-টুনোনগুলো দে দেখি ঠিক করে। বেটারা উনোনসুদ্ধ খুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে।

দীনু চলে যাচ্ছিল।

মাস্টার পুরনো কথার জের টেনে বললেন—ও-ছেলে গুলি খেয়ে মরবে, নয় কাউকে গুলি করে ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, নয় তো বোমা-টোমা করতে গিয়ে নিজের হাতে মরবে। নয় তো—

একটু থেমে বললেন—ধরা পড়ে ডাকাতি ষড়যন্ত্র রাজদ্রোহ

অপরাধে আন্দামান যাবে। মরবার সময় ছেলের হাতের জলও আমি পাব না বাঁড়ুজ্জে, আগুনও না!

খেতে বসে মাস্টার সেই কথার জের টেনে বললেন-- বুঝেছ বাঁড়ুজ্জে, সংসারে যে-জিনিসের যে-অঙ্গের যত মূল্য তারই যন্ত্রণা তত বেশী।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—মাস্টারবাবু! মাস্টারবাবু!

মাস্টার বললেন—দেখ তো দীনু কে? বল আমি আসছি!

দীনু বারান্দার একপাশে বসে ছিল চুপ করে। শুনছিল কথা। বাঁড়ুজ্জে মাস্টারকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল। তরকারির থালা এবং একখানা হাতা হাতে সামনে বসে ছিল। উঠানে একটা কুকুর বসে ছিল উচ্ছিষ্টের আশায়। দুটো কাক বসে ছিল অদূরে।

দীনু উঠে চলে গেল।

বাঁড়ুজ্জে বললে—আর একখানা মাছ দিই। ওই ভাত কটা ভাঙুন।

মাস্টার বললে—গলা দিয়ে যাচ্ছে না বাঁড়ুজ্জে! বলেই পাতের মাছখানা কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন—নে, খা।

দীনু ফিরে এসে বললে—কজনাই দাঁড়িয়ে আছে, মনিঅর্ডার করবে। ধানের মহাজন নন্দী মশায় সুদ্ধ অয়েচেন। তেনার আবার ইনসিওর আছে।

মাস্টার উঠে পড়লেন।

বাঁড়ুজ্জে হাঁ-হাঁ করে উঠল।—উঠবেন না। অম্বল, অম্বল — দিই।

মাস্টার উঠে বললেন—লোকের কাজ আমার দুঃখু মানবে

বাঁড়ুজ্জে। তার ওপর ছেলেটা যা করে গেল—আতে সামান্য খোঁচাতেই আমার চাকরি চলে যাবে ভাই!

আঁচাতে আঁচাতে বললেন—তুই যেন ভাত নিয়ে যাস দীনু। আর সকাল সকাল আসিস বাবা। ভবেশ কখন ফিরবে, কে জানে, হরিহরের জ্বর। ডাক বাঁধা—চালান—সব আজ আমার এক হাতে।

গামছায় ভাতের থালা বেঁধে নিয়ে দীনু মাস্টারের বাসা থেকে বেরিয়ে এল। তখন পোস্টাপিসের বারান্দায় পাঁচ-সাত জন লোক জমে রয়েছে।

কেউ মনিঅর্ডার করছে। কেউ করবে রেজেস্ট্রী।

ঘরের ভিতর মাস্টার টাকা বাজাচ্ছেন। মনিঅর্ডারের টাকা বাজিয়ে নিচ্ছেন! শব্দ উঠছে।

ওদের মধ্যেই রয়েছে চাল-ধানের মহাজন নন্দী মশায়।

তিনি একখানা ইনসিওর-করা খামের শীলমোহর ভালো করে দেখছেন।

ওদিকে বাজারের মধ্যে কোথাও হচ্ছে বাউলের গান। গানটি শোনা যাচ্ছে, বাউলকে দেখা যাচ্ছে না।

বাউল গাইছে

"মনরে আমার হায় শুনলি না বারণ।

সোনার হরিণ ধরতে গেলি—ঘরে হল সীতা হরণ

হায় শুনলি না বারণ!

জীবন-সুতোয় বুনিস যে ফাঁদ সেই ফাঁদেতেই হয় মরণ।

আপন রসের সুতোয় বোনা ফাঁদেই হয় মরণ।

সেই মুহূর্তে উঠল আর-একটা শব্দ। আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ। সশব্দে একখানা প্লেন উড়ে গেল।

দীনু সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

সদর রাস্তা ধরে সজোরে ভাঙা সাইকেল চালিয়ে চলে গেল নিতাই।

সে আস্ফালন করতে করতেই গেল—চল তু কত জোর যাবি। চ—ল।

দীনু ডাকলে—অই- অই- নেতাই! অই।

নিতাই তখন বেরিয়ে চলে গেছে।

বাড়িতে এসে দীনু স্ত্রীকে বললে— নেতাই এলে বলিস, জমিতে জল আছে কিনা দেখতে। বাবু আমাব সাইকেল চড়ে উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে!

সত্থ বললে—উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা?

—হ্যাঁ। সি একবারে বোঁ বোঁ করে চক্ষেব নিমেষে চলে গেল।

সত্থ বললে— উড়োজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে? এখুনি যিটো যেল?

—হ্যাঁ—হাঁ্যা।

—হেই মা গো!

—তাকে তু বলিস,—জমির জল না দেখে এমন করে সাইকেল হাঁকিয়ে বেড়ালে আমার সঙ্গে ভালো হবে না—বলে দেলাম।

—সি উ সব দেখতে পারবে না, সে তুমি আগই আর ওবই! সি চাকরি পেয়েছে।

—চাকরি?

—হ্যাঁ, ওই মহাজনদের গদিতে-মদিতে না কোথা, বটে বাপু। তাগিদে-টাগিদে ফরমাস-টরমাস করবে—মাসে ‘বারো টাকা মাইনে।

—বারো টাকা মাইনে? মাসে যি তার মদে লাগে দশ টাকা। দু টাকাতে প্যাটের ভাত, চুলের ত্যাল, ওই বাহিরে গেঞ্জি ফেরাক দু টাকায় হবে? বলে দিস—আমি আর একটি পয়সাও দোব না, খেতে দিতেও লারব।

বলেই সে চলে গেল তার বল্লম পেটি নিয়ে, জামাটা কাঁধে ফেলে।

তখন সূর্য পাটে বসেছে।

নিজেদের পাড়ার প্রান্তে বেনেপুকুরের পাড়েব উপর দিয়ে যে-পথটা সেই পথ ধরে চলছিল। পূর্ব পাড়ে উঠলেই পশ্চিম পাড়ের ওপারে অবারিত মাঠ। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। লাল আলো পড়েছে মাঠে। মাঠের পথ ধরে আলোব পটভূমিকে পিছনে রেখে বাউল চলেছে তাব হাতের একতারা বাজিয়ে আপন মনেই ওই গানটার শেষ লাইন গাইতে গাইতে—

রসের সুতোর ফাঁদ পাতিলি
নিজেই নিজে ধরা দিলি—
ও তোর রসের নাচন কোদন—শেষে হল হায় কাঁদন।
ও মন শুনলি না বারণ।
এখন ফাঁদ কেটে হ প্রজাপতি নইলে তো আর নাই বাঁচন।
কাঁদিস না মন অকারণ।

দীনু দাঁড়িয়ে শুনলে। বাউল দূবে চলে গিয়ে আমবাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। পাখি কলবব করে উঠল।

সূর্য ডোবে, আবাব ওঠে।

সূর্য উঠছে। পাখি কলবব কবছে।

দীনু ডাক নিয়ে পোস্টাপিস কম্পাউণ্ডে ঢোকে।

কম্পাউণ্ডেব ফুলগাছে ফুল ফুটেছে। প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ফুলে বসে মধু খাচ্ছে।

ভবেশ পিওন ভিতব থেকে দবজা খুললে।

সুবেশ বাঁড়ুজ্জে এল বাইবে থেকে।

আবও দু-একজন ডাক দেখার লোক এল।

সাইকেল চড়ে এল নিতাই। দীনু তখন ভিতরে।

নিতাই নেমেই দবজাব মুখে এসে দাঁড়াল— নিতাই! কী বে? বাড়িব সব—

নিতাই বললে—ভালো আছে। আমি পেওনবাবুকে ডাকছি। ওই লতুন মাড়োয়াবী বাবুব এনসেয়োব আছে কি না শুধোব। বাবু পাঠালে।

দীনু সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিবলে।

ঘবেব ভিতব পিওন ভবেশ তখন ডাক কাটছে।

মাস্টার নিত্যানন্দবাবু বাসাব ভিতব থেকে ঘবে ঢুকছেন।

দীনু বললে—একটুকুন তাড়াতাড়ি করেন বাবু। আমাকে মাঠে যেতে হবে। আউশ-ধান থোড়ের সময়, জল না থাকলে সব্বনাশ হবে।

দীনু মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কোদাল হাতে। আলের উপর পরে রয়েছে ঘাসের বোঝা।

আর গুনগুন করে—আহা—

রসের সুতোর ফাঁদ পাতালি
নিজেই নিজে ধরা দিলি—

হায়—হায় তাই বটে। বলে একটা জল বের হওয়া গর্তে দু কোদাল মাটি কেটে দিয়ে পা দিয়ে চেপে দিতে লাগল। আর বলতে লাগল—কাঁকুড়ির জ্বালাতে অস্থির রে বাবা! অ্যাঁই—অ্যাঁই—অ্যাঁই! লাথির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঁই—অ্যাঁই শব্দগুলি তার মুখ থেকে বের হল তালে তালে।

আকাশে ছায়া নেমে এল। সেখানে মেঘ জমেছে।

মাঠ থেকে ফেরার পথে—বেনেপুকুরের পাড়ে গাছতলায় একটি মেয়ে বসে ছিল—; ঘাসের বোঝা মাথায় দীনু তাকে দেখে চমকে উঠল! এ যে সে সেই রঙ্গিনী বাসিনী।

মেয়েটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে বাঁ হাতে 'কপালের একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে পাক দিচ্ছে; চোখের দৃষ্টি তার সেই চুলের গুচ্ছটির দিকে; এবং মৃদু মৃদু হাসছে।

দীনু হনহন করে চলতে শুরু করলে। ম্লান হয়ে গেছে দিনের আলো। আকাশে মেঘ ঘন হয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মৃদু গর্জন হল মেঘের।

বাড়িতে এসে কোদালখানা রেখে ঘাসের 'বোঝাটা সশব্দে ফেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে যদি নিতাইকে দেখতে পায়।

মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যে সতু সেদিন উঠানে বসে কাটারি দিয়ে একটা শুকনো ডালকে কেটে জ্বালানী তৈরি করছিল।

সম্মানী কোমরে হাত দিয়ে নেচে গাইছিল—নিত্য নতুন ফোটে শালুক,—বাসি ঝবে গেলে হে!

দীনু এসে তার কাঁধে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে—কেটে ফেলাব।

মেয়েটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে।

সতু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বইল। তারপর বললে—ওই, তুমি ক্ষ্যাপলা না কি?

—হ্যাঁ আমি ক্ষেপেছি। সি কোথা?

ক্যা?

—তোর বেটা?

বলেই হনহন কবে বেরিয়ে গেল।

সে গেল মাড়োয়ারীর গদীতে।

লোকজন ধান বোঝাই গাড়িতে চারিদিক ভর্তি। ঢালা ধান পড়ে আছে, চারিদিকে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ধান ঢাকছে তালপাতার চাটাই দিয়ে। বৃষ্টি আসবে।

বারান্দায় গদীতে বসে আছে মাড়োয়ারী! পাশে কর্মচারী লিখছে।

মাড়োয়ারী ইনসিওর-খামে শীল করছে।

দীনু এসে ডাকলে—নেতাই!

একজন কুলীকে জিজ্ঞাসা করলে—নিতাই? নিতাই কোথা মনীন্দ?

—নেতাই? সি আজ ছুটি নিয়ে যেল যি! এই তো যেল। (বলেই হাসলে)

—তু হাসলি ক্যানে মলীন্দ?

—হাসলাম এমনি। তবে তাকে আজ খুঁজো না! পাবে না!

—পাব না?

—হ্যাঁ। তাই সে বলে যেন আমাদিকে।

—হুঁ!

আবার সে হনহন করে চলল।

এল সেই পুকুর পাড়ে গাছ তলায়।

কিন্তু কোথায় বাসিনী? কোথায় নেতাই?

চারিদিকে চেয়ে দেখলে সে। কই?

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দ সে চমকে উঠল—সে হাসি বাসিনীর।

খানিকটা দূরে আর একটা ছায়াঘন গাছতলা। সেই গাছতলা থেকে বাসিনী হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে এল। তার পিছনে পিছনে তাকে ধরতে ছুটে এল নিতাই।

দীনু উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়ে উঠল—নেতাই!

নেতাই থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকালে।

দীনু আবার ডাকলে—নেতাই!

এবার ওদিক থেকে ছুটে এসে বাসিনী নিতাইয়ের হাত ধরে টানলে, বললে—ধ্যেৎ—। এস!

দীনু চিৎকার করে উঠল—আজ থেকে আমি জানব আমি নিব্বংশ, জানব তু মরেছিস!

বলেই সে পিছন ফিরল। পিছনে ভেসে এল বাসিনীর খিল-খিল হাসি।

ইতিমধ্যে নামল বর্ষণ। পুকুরের জলে চড়বড় শব্দে জলের ধারা পড়তে লাগল।

বাড়ি এসে দাওয়ায় বসল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বর্ষণ হচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

মেয়েটা বললে—বাবা!

দীনু বললে—খেলা করগা যা। জ্বালাস না।

বলেই সে উঠল। কণ্ঠস্বরে তার একসঙ্গে ক্ষোভ এবং হতাশার সুর।

সতু সভয়ে বললে—কোথা যাবা?

দীনু উত্তর দিলে না। সেই বর্ষণের মধ্যেই চলে গেল।

মালিকের বাড়িতে এল সে। তখনও রিমিঝিমি বর্ষণ হচ্ছে।

মালিক তখন একলা বসে আছেন। সামনে কাগজ পড়ে আছে। কাগজের হেড লাইনে লেখা—“থানার মালখানা ভাঙিয়া বন্দুক লুট।”

দীনু মালিকের পায়ে ধরে বললে—জমি আমার চাই না বাবু, জমির সাধ আমার মিটেছে। জমি নিয়ে আমাকে টাকা দ্যান। তিন শো টাকা!

—জমি বেচে দিবি?

—ছেলে মটর চালাবার লাইসেন করবে। কোম্পানিকে লাগবে। ফি লাগবে।

--বেশ—তাই নিস। যা জমা করেছিলি তাই নিস, জমি আমি নেব।

বাড়ি এসে সন্তুকে বললে—তাকে বলিস, লাইসেনের টাকা আমি দোব। কিন্তু বাসিনীকে ছাড়তে হবে। বলিস, লইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলব। বুঝেছিস, বলিস!

আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মৃদু মেঘ গর্জন হচ্ছে। তার সঙ্গে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের মধ্যে চলে দীনু ডাক নিয়ে।

অন্ধকারের মধ্যে চলে শুধু লণ্ঠন।

আর ঝুনঝুন শব্দ। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়। সেই আলোতে চলন্ত দীনুর পিছনটা দেখা যায়।

ক্রমে আরম্ভ হয় বন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আরম্ভের দৃশ্যটি ফুটে ওঠে।

ডাক্তারের গাড়ি চলে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে ঘন অন্ধকারে গড়া মূর্তির মতো একটা মূর্তি পাশ থেকে এসে দীনুর সামনে দাঁড়াল।

মাথায় পাগড়ি, মুখে ফেটা বাঁধা। সে এক দুর্বোধ্য মূর্তির মতো। হাতের একটা লোহার ডাণ্ডা উদ্যত করে—চাপা গলায় বললে—রোখকে!

দীনু চিৎকার করে উঠল—খবরদার—।

সে বল্লমটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে।

হাসপাতালে বিছানায় শায়িত বিহ্বল দীনুকে নাড়া দিয়ে নার্স বললে—

—কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার।

দীনু আবার বললে—সরকার বাহাদুরের ডাক!

নার্স দিলে মুখে চোখে জলের ছিটে।

দীনুর সম্বিত ফিরল—সে বললে—অ্যাঁ? অ্যাঁ।

— কী হল। চিৎকার করছিলে কেন?

দীনু বললে—না। চিৎকার করি নাই। ওই কথাগুলান মনে করছেলাম – তাই—

অপ্রতিভের মতো হাসলে।

বুটের শব্দ তুলে প্রবেশ করলেন—এস. পি.। ইনসপেক্টর। কনেস্টবল।

ঢুকবার মুখেই এস. পি. কথা-কটি শুনেছিলেন। তিনি বললেন—মনে করতে চেষ্টা করছিলে? good! তোমার সাহস আছে। একটু চেষ্টা করলেই মনে পড়বে সব।

তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখে বললেন—জানালাটা খুলে দাও তো। অন্ধকার হয়ে গেছে বড্ড।

কনেস্টবল জানালা খুলে দিতেই আলো হয়ে উঠল ঘর।

দীনু চমকে উঠল। সাহেবকে বললে—সেলাম হুজুর!

নড্ করে—সাহেব বললেন—এখুনি তুমি বলছিলে মনে করছিলে সব—মনে পড়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অভিভূতের মতো সে বললে।

—কী হয়েছিল? ডাক্তারবাবু বলছিলেন কয়েক মিনিটের ব্যাপার—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী হয়েছিল? কোথা থেকে এল তারা? ডাক্তারের গাড়ির আলোতে রাস্তার উপর কাউকে দেখতে পান নি।

—আজ্ঞে না।

— তা হলে বনের ভিতর থেকে এসেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই বটতলার ওইখানে—

—হুঁ। সুঁদীপুরের বটতলা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কত জন? ক-জন ছিল তারা? ডাক্তার বলছিলেন, একজনকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ কী? ক-জন ছিল?

—আজ্ঞে?

—ক-জন ছিল—মনে করে দেখ!

—আজ্ঞে অন্ধকার, সি লাফ দিয়ে এসে পড়ল ছামনে—

—কে সে?

—আমি হাঁকিয়ে উঠলাম খবরদার বলে—

সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল দুটি জলের ধারা—

—কেঁদো না, কেঁদো না, কান্নার কিছু নাই। নিজে বেঁচেছ ডাক বাঁচিয়েছ। সহসী লোক তুমি, কেঁদো না।

দীনু তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—আজ্ঞে না।

—এখন বল, সে লোকটা কে? অন্ধকার হলেও খানিকটা নিশ্চয় চেনা যায়।

দীনু স্তব্ধ হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বল! দীনু! ধমকের সুরে ডাকলেন এস. পি.।

দীনু চমকে উঠল।

—বল। তুমি তাকে চেন! চিনতে পেরেছ! অন্ধকারেও তুমি তাকে চিনেছ! বল।

তার খুব কাছে এসে বললেন—পোস্টমাস্টারের ছেলে।

দীনু চমকে বলে উঠল—হুজুর—

—তার হাতে যেটা ছিল—সেটা লোহার ডাণ্ডা নয়, রিভলভার পিস্তল। তারই নলটা তোমার ডাণ্ডার মতো মনে হয়েছে।

দীনু কেঁদে উঠল—আজ্ঞে না। আজ্ঞে না। আজ্ঞে না হুজুর।

—তবে কে বল। অন্ধকার হলেও তুমি তাকে চিনেছ—

—সি- সি—হুজুর—সি—॰

তার মনশ্চক্ষের সামনে আবার ভেসে উঠল।

অন্ধকার বনভূমে কঠিন সংগ্রামের ছবি।

সে বল্লম খুলতে চেষ্টা করছে। বলছে—সরকার বাহাদুরের ডাক—। ক্রুদ্ধ তার কণ্ঠস্বর।

আক্রমণকারী আবার চাপা গলায় বললে—মাড়োয়ারীর দু-হাজার টাকার ইনসেওর আছে। আমি লোব—।

—কে? দীনুর কণ্ঠস্বর যেন বসে গেল।

উত্তর হল—আমি! দাও!

—না—না—না। চিৎকার করে উঠল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে পড়ল ডাকের উপর। আক্রমণকারী ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকের ব্যাগ টেনে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে।

আবার সে চিৎকার করে উঠল আরও জোরে—না—!

ওদিকে থেকে এসে পড়ল মটরের হেডলাইট।

পড়ল আক্রমণকারীর পিছন দিকে। বটের ঝুলে পড়া ডালের ছায়া পড়ল তার উপর। সে হাতের ডাণ্ডাটা তুললে হিংস্র আক্রোশে। পড়ল সে ডাণ্ডা। মোটরের আলো এগিয়ে এল। আক্রমণকারী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বনের মধ্যে।

দীনু একটা চিৎকার করলে—ন-আ-আ—।

ওই চিৎকারের সঙ্গে সুর রেখেই—এস. পি. বললেন—না। তুমি মাস্টারের ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছ। বল সে মাস্টারের ছেলে।

—না। না।

—হ্যাঁ। আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি।

—না হুজুর—মিছে আমি বলতে পারব না—সে—সে আমার—আমার ছেলে!

—তোমার ছেলে—?

দীনুর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নিতাইয়ের ফেটা ও পাগড়ি বাঁধা মুখ ভেসে বড় হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন।

সেই দিকে তাকিয়ে দীনু বললে—সে নেতাই!

চারিদিকে বেজে উঠল যেন মেঘের গর্জন।

দ্বিতীয় পর্ব

ঘরের ভিতরটা দীনুর ওই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর বিদ্যুতালোকের ঝলকে ভরে গেল।

মেঘের গম্ভীর গর্জনে সব যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

ঘরের জানালাগুলি ঝড়ের বেগে আছাড় খেয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আলোয় ভরা ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। আই-বি ইনস্‌পেক্টর এবং কনস্টেবল প্রায় ছুটে গিয়ে জানালা দরজা বন্ধ করে দিলে।

এস. পি. দীর্ঘ এবং ব্যস্ত পদক্ষেপে বের হয়ে গেলেন।

বারান্দা অতিক্রম করে চললেন তিনি। বাইরে মেঘাচ্ছন্ন দুর্যোগময়ী প্রকৃতির অন্তরালে সূর্যাস্তের পরের অন্ধকার নামছে। বাইরে দীনুব চিৎকারে কয়েকজন নার্স কম্পাউণ্ডার বেরিয়ে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘরটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

দুজন নার্স পরস্পরের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

এস. পি. চলে যেতেই একজন বললে—ডাকাত ওর ছেলে!

—স্বীকার করলে?

—চুপ।

কারণ এবার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ইনস্‌পেক্টর।

ইন্‌স্‌পেক্টর চলে যেতেই প্রথম মেয়েটি বললে—এরা সন্দেহ করেছিল রেভুলুশনারীদের কাণ্ড বলে। তা, ও বললে, না সে আমার ছেলে!

অপর মেয়েটি বললে—মা গো।

ওদিকে বৃষ্টি নামল!

এস. পি. হাসপাতালের এদিকের বারান্দা থেকে অপর দিকে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল পোশাকপরা সদাপ্রস্তুত অফিসার ক-জন।

বললেন--আপনি নবগ্রাম চলে যান। এ্যারেস্ট নিতাই দাস—দীনুর ছেলে।

Start immediately. It is already late—

বর্ষণ-মুখর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে সামনের রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাল, মেঘ ডাকল।

এই বর্ষণমুখরতার মধ্যে দাওয়ার উপর একটি হ্যারিকেন জেলে উদাস নেত্রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে সত্তু। তার চোখের কোণ থেকে ঝরে পড়া ছুটি জলের ধারার উপব আলোর ছটা পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।

বাইরে থেকে কেউ ডাকলে—নিতাই। নিতাই!

সত্তু উঠে দাঁড়াল—কে গো!

—আমি। পিওন।

ভবেশ এসে দাঁড়াল—মাথায় ছাতা, হাতে লণ্ঠন।

—কী বাবু? সি কেমন আছে? খবর কিছু আর আইচে!

—এসেছে খবর। ভালো আছে। জ্ঞান হয়েছে। নিতাইকে দেখতে চেয়েছে। আমাদের সায়েব বোলপুরে তার করেছেন। নিতাইকে পাঠাতে বলেছেন। কাল সকালেই যেতে হবে। সে কোথা?

—সে তো বাড়িতে নাই বাবু! সেই কাল দোপর বেলাতে কোথা চলে যেঁয়েচে। আজও তো ফেরে নাই।

তখন সেই দীনুর ডাকবওয়া পথ ধরে—বনের মধ্য দিয়ে চলে আসছে পুলিসের গাড়ি। গাড়িতে কনেস্টবল বোঝাই। সামনে ড্রাইভারের পাশে তুজন অফিসার। হেডলাইটের আলো অন্ধকারকে ভেদ করে সন্ধানী দৃষ্টি হেনে চলে আসছে। অফিসাররা স্তব্ধ, তাদেরও স্থির দৃষ্টি সামনের আলোর দিকে নিবদ্ধ।

একটা রেল স্টেশনে—টিনের শেডের নিচে একেবারে একপ্রান্তে একটি লোহার থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে এক মূর্তি। মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত একখানা কাপড় শীতেব দিনেব র‍্যাপারের মতো ঢাকা। খানিকটা পিছনে শেডের মাঝখানে ছোট একটি স্টলে ক-জন লোক চা খাচ্ছে বিড়ি টানছে। পিছনে অনেক দূরে ট্রেনের সার্চ লাইট।

স্টেশনটির নাম রাজবাঁধ। প্লাটফর্মের গায়ে কাগজে নামটি ফুটে রয়েছে।

ট্রেনটি এসে দাঁড়াল। স্বল্প কয়েকজন লোকের সঙ্গে লোকটিও এগিয়ে এল।

সার্চ লাইটের আলোয় এবার চেনা গেল লোকটি নিতাই। সার্চলাইট সমেত ইঞ্জিন আগে চলে যেতেই সে এগিয়ে এল ট্রেনের দিকে। পিছনে প্লাটফর্ম যেখানে অন্ধকার সেই দিকে। অন্ধকারের মধ্যেই সে উঠল ট্রেনে।

ট্রেনের গার্ড বাঁশি বাজালে।

ট্রেন হুইসিল দিল।

এদিকে হাসপাতালে গভীর রাত্রে স্তব্ধ দীনু নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রয়েছে।

বাইরে বর্ষার ব্যাঙের ডাক উঠছে। ঘরে আলোর চারিদিকে পোকা উড়ছে। দরজার গোড়ায় টুলের উপর একজন কনেস্টবল ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

একজন নার্স বারান্দার ওপাশ থেকে জুতোর একটি একক শব্দ তুলে এসে ঘরে ঢুকল।

এসে দাঁড়াল—দীনুর পাশে।

দীনু তবু তেমনি স্থির, সেই নিষ্পলক দৃষ্টি এতটুকু ফিরল না। সে যেন পাথর হয়ে গেছে।

নার্স সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—এ কী? তুমি—তুমি ঘুমোও নি?

দীনুর কণ্ঠস্বর থেকে শুধু বের হয়ে এল—উঁ—হু!

—ঘুমের ওষুদ দিলাম—তবু ঘুম আসছে না?

—উঁহু!

নার্স একটু জল ভিজিয়ে তুলো দিয়ে কপালটা ভিজিয়ে দিলে; মাথায় একটু দিয়ে দিলে। তারপর বললে—একটু জল খাও।

—উঁ—হু!

—তা হলে চোখ বোজো, ঘুমুতে চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ কর।

দীনু চোখ বন্ধ করলে।

নার্স চলে গেল। পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

দীনুর চোখ আবার খুলে গেল। এবার নিশব্দে জলের দুটি ধারা গড়িয়ে এল চোখ থেকে।

দূরে কোথায় ঘড়িতে টাওয়ার ক্লকে—ঢং ঢং ঢং শব্দে তিনটে বেজে গেল। একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথায়। একটা প্যাচা ডাকল। খানিকক্ষণ ঝিঝিব শব্দ হল। সাপে ব্যাঙ ধরার শব্দ উঠতে লাগল। তাব মধ্যেই ওই ব্যাঙেব ক্লান্ত কাতর শব্দই রূপান্তরিত হয়ে বাজল ঢং ঢং ঢং ঢং অর্থাৎ চাবটে । বাইরে আকাশ ফরসা হল।

সকাল হল। ভোর বেলা—

দীনুর বাড়িতে তখন পুলিস এসেছে। ঘিরেছে। দূরে দূরে পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। উঁকি মারছে।

সত্নু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দাওয়ায়। একজন দারোগা প্রশ্ন করছেন—নিতাই সেই পরশু বেরিয়ে আর ফেরে নি ?

সত্নু ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বললে—না মশায় !

—কোথায় গিয়েছে ? বল !

—জানি না মশায় !

—কে জানে ! তোমার স্বামী ?

—আজ্ঞে না। সেও জানে না। সে বাসিনী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে কোথা গিয়েছে।

—বাসিনী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কে বাসিনী ?

—জানি না মাশায়। শহর থেকে নেতাই তাকে ভাঁজো নাচতে এনেছেল। তার লেগে ওর বাবার সাঁতে ঝগড়া ; আমি কত বলেছি—

তা সি শোনে না! তার বাবা সি দিন মেয়েটার সাঁতে দেখে তাকে বলেছিল—আজ থেকে আমি জানব আমি নিব্বংশ। তবু মানে নাই—সেই মেয়েটার সাঁতেই চলে যেয়েছে।

—হুঁ!

ওদিকে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন আর একজন অফিসার। বললেন—নাথিং ফাউণ্ড। নো ট্রেস। চল।

ওদিকে নিতাই চলেছে সেই ট্রেনে।

গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের একটা ট্রেন। হঠাৎ ট্রেনটা সিগন্যাল না পেয়ে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের বাইরে দাঁড়িয়ে গেল।

প্যাসেঞ্জাররা মুখ বের করে দেখছে। নিতাইও দেখছিল।

জায়গাটার চেহারার সঙ্গে বাংলাদেশের সাদৃশ্য নেই। পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দূরে বন-রেখা।

নিতাই হঠাৎ উঠল এবং দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দু-চার জন লোক নিচে নেমে দেখছে। কেউ দাঁতন ভাঙছে। সেও নামল। খানিকটা মাঠের দিকে গেল। একবার ফিরে দেখলে ট্রেনটার দিকে।

তারপর—রেলের সীমানার তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে বেরিয়ে হনহন করে চলতে লাগল।

পিছনে হঠাৎ সিটি বাজল। সে আবার পিছন ফিরলে। দেখলে সিগন্যাল পড়েছে। গাড়ি হুস করে ধোঁয়া ছেড়ে নড়ল। চলল।

সে আবার পিছন ফিরে চলল। দ্রুত বেগে। তারপর ছুটতে লাগল। ট্রেনটা চলে গেল।

সে ছুটল। কাঁধে সেই ব্যাগটা যে-ব্যাগটা যেটা কাঁধে নিয়ে বাসিনীর সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল।

সকালবেলায় ঠিক প্রায় সেই সময়েই—দীনুর বেডের সামনে—পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তাকে বলছিলেন—তুমি বলেছ সে তোমার ছেলে ?

দীনু সেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল। সে উত্তর দিল না।

তিনি আবার ডাকলেন—দীনু ! দীনু !

—আঁ।

—তুমি বলেছ—ডাকাত তোমার ছেলে ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে দীনু।

--তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে ? সঙ্গে সঙ্গেই দীনু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

সুপার তাঁর কথাসূত্রে একসঙ্গেই বলে গেলেন—অন্ধকারে ভুল হয় নি তো ?

দীনু ঘাড় নাড়লে—না।

সুপার ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে বোধ করি সবিস্ময়ে দীনুর কথাই ভাবছিলেন।

দীনু মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বললে—মিছে কী করে বলব ?

ঘাড় নাড়তে লাগল শুয়ে শুয়ে—ধীরে ধীরে—'না' 'না' এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল সে।

সুপার তার গায়ে হাত রাখলেন।—তোমার যে জ্বর হয়েছে দীনু।

দীনু একটু বিষণ্ণ হাসলে।

—এ যে বেশ টেম্পারেচার। ডাক্তারবাবু!

তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন ব্যস্ত ভাবে।

ওদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে—অরণ্যভূমের প্রান্ত দেশ। সেখানে একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে ধুলোর ওপর শুয়ে আছে নিতাই। সর্বাঙ্গে ধুলো। মাথায় সেই ব্যাগটা। হঠাৎ সে মুখ তুললে। অস্তমান সূর্যের আলো তার মুখের উপর পড়ল। তার চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে।

আবার সে মুখ গুঁজলে—মনশ্চক্ষে দেখলে সেই অন্ধকার রাত্রের বাপের ডাক ব্যাগ আঁকড়ে-ধরা ছবি!

সে আবার ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর উঠল। চলতে লাগল।

দূরে কোথায় বয়লারের সিটির শব্দ হল।

সে চমকে উঠে দাঁড়াল।

এদিকে টাওয়ার ক্লকে বাজল ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং। পাঁচটা।

থানায় দারোগা, এস. পি. ইন্সপেক্টরের সামনে বাসিনী বসে আছে।

সে বলছে—আমি জানি না মশায়—সে কোথা! আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি— ভগবানের দিব্যি করে বলতে পারি।

সে কথাগুলি বলছে—বিনয়ের সঙ্গেই বটে কিন্তু সপ্রতিভতা আছে তার মধ্যে।

—ভগবানের দিব্যি করে?

—কালী দুর্গা হরি যার দিব্যি করতে—

—চোপ রও হারামজাদী—

চমকে উঠল বাসিনী। থেমে গেল।

—কালী দুর্গা হরি—! ব্যঙ্গ করে বললেন এস. পি.।—তুই জানিস।

—আমি জানি না। আমি জানি না। হুজুর আমি জানি না। সে আমার কাছে আসত; যখন আসত—দুটাকা একটাকা দিত। আমার সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছিল। আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলি। আমি চাই নাই। বলেছিলাম—ওই ওদের ঘরে থাকতে আমি লারব—

— হ্যাঁ—তোকে চড় মেরেছিল। তুই ওর বাবাকে গাল দিয়েছিল!

—হ্যাঁ। সত্যি কথা। কিন্তু তার পরেতে আবার সিদিন আমার কাছে এসে পাঁচটাকা নগদ দিয়ে ভাব করে গিয়েছিল। বিয়ে করতে চেয়েছিল। বলেছিল টাকার যোগাড় করেছে—লাইসেন লেবে মটর ডেরাইবারির। আমি সেদিন না বলেছিলাম। কিন্তু রাতে ভেবে দেখলাম—চুপ করে গেল সে।

—কী বল!—এই! বল!

—হুজুর আমার সন্তান হবে। উরিরই সন্তান। তাই সোকালে আমি নিজেই গিয়েছিলাম তার কাছে। তার বাবা আমাকে দেখতে লারে; তাই গাঁয়ের ধারে গাছতলায় বসে কথা পাকা করে নিয়েছিলাম। সে আমাকে কথা দিয়েছিল—বিয়ে করে সে আমাকে নিয়ে দূর-দেশে চলে যাবে কোন শহর বাজারে বলেছিল—টাকার যোগাড় তার হয়েছে; কাল সকলেই টাকা নিয়ে সে আমার কাছে

আসবে। আমাকে তৈরী হয়ে থাকতে বলেছিল। গাছতলা থেকে বেরিয়ে আমি চলে আসছি।—একটুকুন জল খাব হুজুর।

—জল দাও।

কনেস্টবল জল দিল। একটা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসে।

জল খেয়ে বাসিনী আবার বললে—যখন চলে আসছি—তখন উয়োর বাবা দেখতে পেয়েছিল, একটা পুকুরের পাড় থেকে হুজুর সি ডেকেছিল। আমার ভয় হয়েছিল—বাবার কাছে গেলেই তার মন পালটাবে। বাবাকে ভারি ভালোবাসত। তাই আমি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছেলাম আমার বাড়ি পয্যন্ত। সাঝে পয্যন্ত আটকিয়ে রেখে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওর বাবা সাজের সময় ডাক নিয়ে যায়। আর বলেছেলাম, ভোরে আমি তৈরী থাকব। সে যেন টাকার যোগাড় করে নিশ্চয় আসে। কিন্তু সি আসে নাই। আমি আর কিছু জানি না হুজুর। কিছু জানি না। আমার কুক্ষিতে সন্তান আছে হুজুর তার দিব্যি।

—চল ওকে হাসপাতালে নিয়ে চল। দীনুর সামনে।

হাসপাতালে দীনুর তখন প্রবল জ্বর।

সে প্রলাপ বকছে।

নার্স মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছে।

দীনু চিৎকার করলে—খবরদার।

তার হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। উঠে বসতে চাইল।

নার্স চেপে ধরলে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠল—না—না—না। নেতাই—না।

আবার কয়েক মুহূর্তপর বললে—না—না—না। মাস্টারবাবুর ছেলে লয়। সি আমার ছেলে। সি নিতাই। মিছে কথা বলতে আমি পারব না। পারব না!

হঠাৎ দেখা গেল দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এস. পি.।

তার পিছনে অফিসারেরা এবং বাসিনী।

এস. পি. ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন—ডিলিরিয়াম? ভুল বকছে?

নার্স বললে—হ্যাঁ সার।

—টেম্পারেচার হয়েছে?

—একশো দুই।

দীনু বলে উঠল—নেতাইরে! ও নেতাই! নেতাই!

এস. পি. নিজেই পাখাটা বাড়াবার চেষ্টা করলেন।

দীনু হতাশ কণ্ঠে বললে—যাঃ নেতাই হারিয়ে গেল।

তারপরই বললে—ও বাবা কী অণ্ডকার!

এস. পি. বেরিয়ে গেলেন।

ঘন অন্ধকার অরণ্যের মধ্য দিয়ে –

শিল্যুট মূর্তির মতো একটি মূর্তি চলেছে। দূরে আকাশের গায়ে চিমনীর মুখে আগুন।

লক্ষ্য তার সেই দিকে।

পরদিন সকালে এস. পি. অফিসে ইনস্‌পেক্টারকে বললেন—মেয়েটাকে ছেড়েই দাও। একটু স্তব্ধতার পর বললেন—ও এর বেশী কিছু জানে না। ছেড়ে দাও। বলে দাও কোথাও যেন না যায়।

কীপ ওয়াচ ! এস. পি. ইনস্পেক্টর চলে গেলেন। ঘণ্টা বাজালেন। আর্দালীকে বললেন—নিরঞ্জনবাবু।

আই. বি. নিরঞ্জনবাবু এসে দাঁড়াবা মাত্র বললেন—এইটে—সারকুলেশনের জন্যে আজই টু অল রেলওয়ে স্টেশনস—পোস্ট অফিসেস—আদার পাবলিক প্লেসেস; ফটোগ্রাফ থাকলে ভালো হত কিন্তু উপায় নেই।

কাগজটা হাতে দিলেন।

আই. বি. বললে—Postal department-এর চিঠিটার—? বলতে চাইলে কী জবাব দেব—বা কী করব?

এস. পি. বললেন—সারটেনলি। দীনু মাস্ট বি রিওয়ার্ডেড। আমরাও কিছু রিওয়ার্ড দিতে চাই পুলিস থেকে। লোকটা—

তাঁর মনশ্চক্ষে রোগশয্যায় শায়িত দীনুর সেই ছবিটুকু ভেসে উঠল—না। মিছে কথা আমি বলতে পারব না। মাস্টারবাবুর ছেলে নয়। সে—সে আমার আমার ছেলে।

এ. পি. বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে লনে অজস্র ঘাসের ফুল ফুটেছে।

নবগ্রাম পোস্টাপিসে নিতাইয়ের বিবরণ সম্বলিত সারকুলারটি টাঙানো রয়েছে নোটিশ বোর্ডে।

সেটি পড়ছে—সুরেশ বাঁড়ুজ্জে।

বিজ্ঞপ্তি

৫০০৲ টাকা পুরস্কার

ফেরারী আসামী নিতাইচরণ দাস—বয়স কুড়ি বাইশ লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। রঙ কালো—সবল স্বাস্থ্য—গলায় কারে বাঁধা রুপোর তক্তি।

নিত্যানন্দবাবু বেরিয়ে এসে বললেন—পড়ছেন?

—হ্যাঁ।

বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—এমন বাপের ছেলে ছোঁড়াটা এ কী করলে বলুন দেখি!

নিত্যানন্দ বললেন—আমার দিকে চেয়ে দেখুন না। আমার মতো ভীতু, সরকারী গোলাম—আমার ছেলে—

—সায়েব না কি দীনুকে অমরের নাম করতে বলেছিল?

চাপা গলায় বললে সুরেশ।

—হুঁ। কিন্তু সে তা করে নি।

—দীনুকে না কি রিওয়ার্ড দেবে?

—হ্যাঁ। আমাদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে আড়াই শো টাকা। আর পুলিসও বোধ হয় দেবে।

একজন পিওন ডাক হাতে—রেজেস্ট্রী ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে গেল।

নিত্যানন্দ বললেন—দীনুর বাড়ির একবার খোঁজ নিও ভবেশ!

সুরেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই নোটিশটা পড়তে লাগল—"৫০০৲ টাকা পুরস্কার।"

ওদিকে দীনু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তার মাথাটা কামানো। সেখানে একটা ক্ষতচিহ্ন।

তার সঙ্গে একজন সাবইনস্‌পেক্টর অব পুলিস।

একটা রূঢ়দর্শনা জমাদারনী একটা বেড প্যান পরিষ্কার করে নিয়ে ফিরছিল।

সে বললে—যাচ্ছে? হসপাতাল সে ছুট্টি?

দীনু ম্লান হেসে বললে—হ্যাঁ।

—তোহ্‌রা বেটা? বেটাকে পতা মিলল? না মিলল?

বলতে বলতেই দীনু তাকে অতিক্রম করে চলে গেল।

মেয়েটায় বলতে বলতে গেল—না মিলেসে—উ বেঁচেসে। তু অচ্ছা বাপ!

সাবইনস্‌পেক্টর ধমক দিলেন—এই! যাও আপনা কামসে যাও।

তাকে নিয়ে এল জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে।

পোস্টাল সুপার, পুলিস সুপারও উপস্থিত সেখানে।

ডি. এম. তাকে একটি থলি হাতে দিয়ে বললেন—সরকার বাহাদুর তোমাকে এই আড়াই শো টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। আর এই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন—পুলিস থেকে। তোমার সাহসের জন্য কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য; সবচেয়ে বড় কথা তুমি তোমার নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যেও সত্য গোপন কর নি, মিথ্যা অন্যের নাম কর নি এই দুর্লভ সততার জন্যে তোমাকে দিচ্ছেন। ধর।

দীনু কলের পুতুলের মতোই নিলে। হেট হয়ে নমস্কার করলে।

এস. পি. বললেন—হ্যাঁ। সাহস থাকলে এবং দেহে শক্তি থাকলে ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। হয়তো লড়াই করে রুখতেও পারে। লড়াইয়ের মধ্যে মরতেও পারে। কিন্তু—।

পোস্টাল সুপার বললেন—তোমার জন্যে এক মাসের ছুটি স্যাংশন করেছি।

দীনু বললে—ছুটি ?

—হ্যাঁ। বিশ্রাম নাও।

—বি-স্ সেরাম !

—হ্যাঁ। শরীরটা সারা দরকার !

—আজ্ঞে বেশ !

দীনু গ্রামে ফিরল।

ঠিক প্রবেশমুখেই থমকে দাঁড়াল।

সামনেই সদর রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। দু পাশে দোকানদানী। লোকের ভিড়।

দূরে দেখা যাচ্ছে—একটা দোকানের সামনে বাউল গান করছে—

কুল আর, কলঙ্ক নিয়ে, কি করি হায়, বলবে কে সে ?
কুলে আমার, সোনার শয্যে, কলঙ্ক, কালো ভাল্লো বেসে।
শ্যাম কালো এ নয়ন কালো! কলঙ্ক মোর, কালো কেশে ?
কালো আমার চোখের তারা কি করি হায় বলবে কে সে ?

কুল রাখি, না, শ্যাম রাখি হায়
কুল রাখিলে শ্যাম যে হারায়—

শ্যামের প্রেমে, কুল ভেসে যায়, অকূল পাথার, ডুবি শেষে !
পা-থারে—
(ও-অকূল পাথার-তল নাই তার ডুবি শেশে—)
কি করি হায়, বলবে কে সে ?

কুলের সোনার, কোটায় আমার, প্রাণ ভ্রমরার বাস ;
কালিদহের, শ্যাম-কমলের, মধুই শুধু আশ ;

কুল গিয়েছে শ্যাম গিয়েছে
সোনার রাধা লু-টা-ই-ছে—
তবু রাধা কলঙ্কিনী, নাম রটিল, দেশে দেশে।

গানের মধ্যেই সামনে রাখা ভিক্ষা পাত্রে ভিক্ষা পড়ে গেল।

গান শেষ করেই সে—বোল হরি বোল, বোল হরি বোল—বলতে বলতেই পাত্রটি তুলে নিয়ে চলতে লাগল। হাতে তার একতারাটি টুং টং শব্দে বেজেই চলল।

দীনুর বাড়িতে তখন দীনু এসে স্তব্ধ মূক হয়ে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। প্রথম ঝড়টা কেটে গেছে। সদু মাটির উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পাড়া-প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকেই কথা বলছে। কথা নয় বাণ। শব্দভেদী বাণের মতো কথাগুলি এসে তাকে বিদ্ধ করছে। নিক্ষেপকারীকে দেখা যাচ্ছে না।

নারী এবং পুরুষের কণ্ঠ দুইই আছে।

—বলিহারির বাবা বটে বাবা। বাহাদুর বাবা!

—জিভ দিয়ে বেরুলো তো ছেলের নাম?

—পাথর লো পাথর। বাবা নয় পাথর।

—ধাম্মিক লোক। পাথর নয়—ধাম্মিক!

—যুজিস্টির! দীনবন্ধু নয় উনি আমাদের যুজিস্টির—

—লগদ তিন শো টাকা পেনে যুজিস্টির সবাই হয়।

—এই বার ধরিয়ে দিয়ে আরো পাঁচশো পাবে।

এবার ঘরের একটা কোণের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল এক বৃদ্ধা। সে বললে—ই সব তোমরা কী বলছ? বলি ধরম তো একটা আছে, না নাই? দেবতা না হয় পাথরের, কিন্তুক ধরম তো সত্যি না কী? দীনু তো অন্যায় অধরম করে নাই! লোকটাকে বিঁধছ ক্যানে এমন করে?

—অ-মা গ্ অ! এ যে সেই বন থেকে এলেন মাসী বুন্‌পো তোকে ভালোবাসি! সেই বিত্তান্ত! বুনপোর পরে হাঁড়ি ফাটা ভাতের মত ভালোবাসা একেবারে ছতবস্কার হয়ে যেল!

চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল।

বুড়ি বললে—বলি তা হলে মুখ খুলব না কি? হাটে হাঁড়ি ভাঙব নাকি? বলি ওলো—অ লেবারণের বউ! বুড়ো হলেও কান আমার খুব খর লো! একে ঘুম হয় না, বুড়ো মানুষের ঘুম কম। আত দুপুরে গলি দিয়ে পা মটমটিয়ে লেবারণ কোথা যায় লো? আবার শেষ আতে—

দীনু এতক্ষণে বললে—চুপ কর মাসী! পাঁচ জনার মুখ, দু হাত দিয়ে কী করে বন্ধ করবা বল! ওই দেখ সত্তু কাঁদছে। তার মায়ের পরাণ, কী বলব তাকে? টাকাও তো আমি পেয়েছি মাসী। নিয়েছি। আবার সি যদি কোনো দিন ফিরে আসে তবে—? তখন কী করব আমি? ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললে—সি যেন আর ফিরে না আসে মাসী। কখুনও না আসে—।

সেই সময়েই নিতাই হাজারিবাগ অঞ্চলে একটি ছোট শহরে একটি মোটর মেরামতের কারখানায় একটা লরির পাশে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। তার গায়ে তেলকালী লাগা একটি গেঞ্জী। পরনে একটা

তেমনি হাফপ্যাণ্ট। লরিটা মেরামত হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে বড় একটা কারখানার চিমনী।

নিতাইয়ের মুখে বয়সের অনুযায়ী দাড়িগোঁফ বেরিয়েছে। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া হয়েছে।

একটা গাছতলায় মালিকদের দুজনে বসে কাগজ পড়ছেন।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার! ফেরারী আসামী নিতাই চরণ দাস বয়স বাইশ-তেইশ। লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। রঙ কালো—সবল স্বাস্থ্য—।

অন্যজন বাধা দিয়ে বললেন—খবর ছেড়ে বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলে। খবর পড়।

নিতাই ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালে। তারপর ঘুরে বসল।

ভিতর থেকে কেউ ডাকলে—এই নতুন ছোকরা! কী নাম? এই!

—আজ্ঞে গৌর।

—একটু এগিয়ে দেখ—সাইলোসার পাইপটা মেরামত করতে গিয়েছে, আসছে কি না দেখ তো।

নিতাই বললে—যাই! যাবার সময় গাছের ডালে ঝোলানো জামাটা নিয়ে কাঁধে ফেললে।

সে বেরিয়ে এল রাস্তার উপর।

খানিকটা এসে রাস্তা থেকে নেমে সে প্রান্তরে নেমে পড়ল।

কিছু দূর এসে সে পেলে একটা শাল জঙ্গল। তার ভিতর ঢুকে সে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজলে। যেন এলিয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার সোজা হয়ে বসল। কোমর থেকে বের করলে একটা গেঁজলে।

সেটা খুলে একে একে বের করলে একখানা দশটাকার নোট, একখানা পাঁচ টাকার, খান তিনেক একটাকার; খুচরো কিছু রেজকি। তার সঙ্গে বের হল একটা কারে বাঁধা রুপোর তক্তি। তক্তিটা তুলে দেখলে। সেটাতে নাম লেখা 'নিতাই'। একটা পাথরের উপর রেখে সেটাকে অন্য একটা পাথব দিয়ে ভেঙে ফেললে। তারপর একে একে আবার সব পুরলে। কোমরে বাঁধলে। আবার চোখ বুজে গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসল। চোখ দিয়ে জল গড়াল। সেই অবস্থাতেই জামাটার পকেট খুঁজে বের করলে খবরের কাগজে মোড়া কিছু।

একটা আধ খাওয়া পাউরুটি।

ক্লান্তভাবে খেতে লাগল।

খেতে খেতেই উঠল, চলল।

কিছু দূর এসেই একটা ছোট জোড়—অর্থাৎ পাহাড়িয়া নালা। এক পাশে শীর্ণ জলধারা বয়ে যাচ্ছে। সেখানে জল খেয়ে নিয়ে আবার চলল।

কোথায় যাবে?

সামনে পাথুরে প্রান্তর। পায়ে চলা পথের রেখা চলে গেছে। কোথায় মুখ কে জানে?

থমকে দাঁড়াল।

হঠাৎ চোখে পড়ল এক পাশে অর্থাৎ ডাইনে বা বাঁয়ে আকাশের গায়ে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া লম্বা হয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

রেলের ধোঁয়ার মতো।

রেলের ধোঁয়াই বটে। দূরান্তের ট্রেনের হুইসিল শোনা গেল।

দিক পরিবর্তন করে সে সেই মুখে চলল।

আকাশে তখন সন্ধ্যা নামছে। পাখিরা নীড়ে ফিরছে। কলকল শব্দ উঠছে।

সে শব্দ শুনে একবার আকাশের দিকে তাকাল। একটা গাছে পাখিরা বসল।

সে দেখলে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার চলল।

অন্ধকারে এতক্ষণে নজর হল—একটা সবুজ আলো। সিগন্যালের আলো।

সে চলতে লাগল। চলবে সে। বাঁচবে।

দীনু আপনার গাড়িতে গোরুর কাছে বসে তাদের গায়ে হাত বুলুচ্ছে।

সতু সেই শুয়ে আছে। পা থেকে মুখ পর্যন্ত ঢেকে; প্রায় মৃতের মত পড়ে আছে সে। নিস্পন্দ, নীরব।

দীনু হঠাৎ যেন বললে—শুনছিস? ওঠ!

সতু ঘাড় নাড়লে—না—না—না।

—না লয়। ওঠ। কী করবি? বাঁচতে হবে তো!

এবার সতু বললে—না—। বাঁচতে সাধ আমার নাই। সে-সাধ আমার মিটেছে। পথে ঘাটে লোকে টিটকিরি দেয়—বলে যুজিস্থিরের পরিবাব। শুধু যুজিস্টির লয়, লগদ তিনশো টাকার যুজিস্টির—

তার কথার আবেগের মুখে বাধা পড়ল।

—দীনু—দীনু। দীনু রয়েছিস? বলে কাগ

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে!

সতু ঘোমটা টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে বললে—খবরের কাগজে তোর কথা বেরিয়েছে দীনু। ছবিসুদ্ধ। এই দেখ!

দীনুর হাতে সে কাগজখানা দিলে।

সুরেশ বলছিল—আমি পাঠিয়েছিলাম। ওরে অন্য দেশ হলে—

দীনু কাগজের ছবিটাব দিকে তাকিয়ে দেখে—আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

লম্বা ফালি করে—একটা দুটো তিনটে ফালি করে দিলে।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল।

ছেঁড়া হয়ে গেলে—ধবা গলায় অপরাধীর মতো বললে—দীনু আমি বুঝতে পারি নাই। আমাকে তুই—। তুই কিছু মনে করিস না—

এরই মধ্যে দীনু ধীরে ধীরে উঠল—এবং চলে গেল বেরিয়ে। কথা শুনবার জন্যে বা উত্তর দেবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল না।

সুরেশ বাঁড়ুজ্জেও চলে গেল মাথা নিচু করে।

শূন্য অঙ্গনটায় ছুটে এসে ঢুকল একটা বা দুটো ছাগল ছানা, কয়েকটা হাঁস মুরগী। এই সময়ে এসে ঢুকল সেই পিসীবুড়ী তার কাঁখে একটা মাটির কলসী।

—অ বউ! আন্না চড়িয়েছিস নি কি? কই? কোথা গেলি সব? আমার দেরি হয়ে গেল। ওই নোটন থানদায়ের সঙ্গে লেগেছেলাম। বলঁলাম, তু চোরকে বলিস চুরি করতে গেরস্তকে বলিস সতর হতে; তু বুঝ্‌বি না। এ তু বুঝবি না।

কলসীটা নামিয়ে দাওয়ায় উঠল সে।

—কই গেলি কোতা? অ—হ—হ—কোথাও কিছু নাই—কাঠ মাঠ—

সন্তু বেরিয়ে এল।

—তোমাকে আর করতে হবে না পিসী! আমি নিজেই চড়াছি আন্না।

—কষ্ট? আমার? সর। বেশী বকিস না। তু বোস! যোগাড়টা করে দে শুধু!

দীনু ফিরে এসে তার বল্লম পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পিসী বলে—ও দীনু উসব নিয়ে কোথা চল্লি?

—কাজে! ছুটি বাতিল করে দেলাম।—ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সে চলে গেল।

সে চলবার সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগল ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ।

ঝুন ঝুন শব্দ রাত্রির অন্ধকারে বাজতে থাকে অরণ্যপথে।

ওদিক থেকে আসে মোটরগাড়ি।—প্লেটের—নম্বর—1942!

বারেকের জন্য ঝুন ঝুন শব্দ থামে।

দীনুকে দেখা যায় না। তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় চাপা গলায় ডাকে—নেতাই!

একটা রাত্রিচর প্যাঁচা ডেকে ওঠে! ক্যাচ—ক্যাঁচ।

আবার ওঠে ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন শব্দ।

আবার আসে মোটর—এবার প্লেটে লেখা—1943.

আবার শব্দ থামে।

আবার ডাকে দীনু—নেতাই।

এবার ডেকে ওঠে শেয়াল। অথবা সেই পেঁচাই ডেকে ওঠে।

আবার শব্দ ওঠে ঝুন— ঝুন—ঝুন—ঝুন।

আবার গাড়ি আসে—

পর পর পেরিয়ে যায় 1944—1945.

দীনুর ডাক শোনা যায় তুবার—নেতাই! নেতাই!

কুকুব ডাকতে থাকে ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ—!

বোলপুরের আলো দেখা যায়।

তারপর আসে বোলপুব স্টেশন।

বোলপুর প্লাটফর্মে বাসিনীকে দেখা যায়—একটি চার-পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে ঘুরছে। ছেলেটা ঘুমন্ত। প্যাসেঞ্জারদের কাছে ভিক্ষে কবে বেড়াচ্ছে। ভিক্ষে করলেও তার স্বভাবের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট। সাজ পোশাকের জীর্ণতাব় মধ্যেও।

হঠাৎ এসে বাসিনী থমকে দাঁড়ালো।

ল্যাম্প-পোস্টের নিচে তুজন বানার বাঘবন্দী খেলছে। তার একটু দূরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে দীনু। দীনুর মুখে চোখে চুলে কয়েক বৎসরের ক্লান্তির চিহ্ন।

বাসিনীকে দেখে একজন রানার বললে—ও বাবারে!

অপরজন বললে—ক্যা—রে?

—আমাদের যুজিষ্টিরকে দেখছে লাগছে? কী কাণ্ড?

বাসিনী এগিয়ে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠস্বরে বললে—রাক্ষস! তু রাক্ষস! তু রাক্ষস!

দীনু চমকে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল।—রাক্ষুসী, ডাইনী,—তু সেই বাসিনী!

—হ্যাঁরে ছেলে-খেকো রাক্ষস— আমি সেই—

—খবরদার!

—কেয়া হুয়া? কনেস্টবল এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন!

বাসিনী এবার ছুটে পালিয়ে গেল।

দীনু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল!

লোকে প্রশ্ন করতে গেল। কিন্তু সে সমস্ত ঢেকে বাজল ঢন-ন-ন ঘণ্টা। প্লাটফর্ম সার্চলাইটের আলোয় আলো হয়ে উঠল।

দীনুর বাড়িতে শেষ রাত্রে অন্ধকার ঘরে রুগ্না সত্নু ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল—নে-তা-ই!

পাশেই শুয়ে ছিল বুড়ী পিসী!

সে জেগে উঠল—ডাকলে—বউ!

আবার ডেকে উঠল সতু—নেতাই! এবার চাপা গলায়।

পিসী আবার ডাকলে—বউ!

—দেখ তো পিসী, তুয়োরটো খোল তো। দেখ তো! মনে হল সি ডাকলে!

সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে।

—উঠিস না। তু উঠিস না। আমি দেখছি।

পিসী তাড়াতাড়ি উঠে ডিবে জ্বেলে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

তখন ভোর হচ্ছে। পাখি ডাকছে মধ্যে মধ্যে।

উঠান জনশূন্য। রাত্রির আকাশও যেন ধোয়ামোছা। ভোরের আমেজে তারাগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেছে। উঠানের ফুলগাছটা পুষ্পহীন রিক্ত।

শুধু একটা কুকুর শুয়ে ছিল উঠানে। সেটা সাড়া পেযে উঠে দাঁড়াল। লেজ নাড়তে লাগল।

ভিতর থেকে সতু প্রশ্ন কবলে—পিসী?

--কই, কেউ কোথাও তো নাই বউ!

সতু এবার কোনোক্রমে দরজার মুখে এসে ডাকলে- নেতাই!

পিসী বললে—তা হলে তু স্বপন দেখেছিস বউ!

সতু বললে—স্বপন? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হবে।

সকালবেলায় দীনু ডাক নিয়ে ফিবে আসাব পর সতুর শিয়রে বসে তার সকালবেলার মুড়ি এবং অল্প একটু মদ খেতে খেতে প্রশ্ন করলে—

---কী স্বপন দেখলি সতু?

সতু ঘরের চালের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে তাকিয়ে সেই স্বপ্নের স্মৃতিরই যেন রোমন্থন করছিল। সে চুপ করেই রইল।

দীনু বললে—স্বপন হয়তো লয় সতু! সেই হয়তো এসেছিল।

সতু উত্তর দিলে না।

দীনু বললে—সেই বাসিনী মেয়েটারে কাল এতে বোলপুর ইস্টিশানে ভ্যাখলাম এতকাল বাদে। কোলে একটা ছেলে। আমার সন্দ হছে সতু!

সতু এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলে।

দীনু বললে—সন্দ হছে সত্ন ; সিও ওই বাসিনীর সাঁতেই আছে। বনে-জঙ্গলে—না-হয় কোথাও—

সত্ন বাধা দিয়ে বললে—উঁহু ! উঁহু !

দীনু সবিস্ময়ে বললে—কী ?

সত্ন বললে—আমি দেখলাম সি একটো মস্ত নদী—শুধুই জল—তারই মধ্যে এই বড় বাড়ির মতন কী একটো। তার উপরে মস্ত খুঁটি—সি তারই ওপরে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে।—মা—। পষ্ট 'মা' আমার কানে এল। ঘুমটো ভেঙে গেল। আমি 'নেতাই' বলে চেঁচিয়ে ওঠলাম। তার পরেতে মনে হল—সি হয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে !

ওই স্বপ্নের ছবিটা তার চোখের উপর ভেসে উঠল।

কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে শিলুটের মতো ছবি। একটা স্টীমারের মাস্ট ধরে নিতাই দাঁড়িয়ে আছে।

মুছে গেল সে-ছবি। সত্ন ঘাড় নেড়ে বললে—বাসিনীর সাঁতে ? না-না বলে সে ঘাড় নাড়লে।

—ছেলেমানুষ—পেথম জন বয়েসে ভুল করেছিল। কিন্তু। না-না বলে আবার ঘাড় নাড়লে।

দীনুও আপন মনে ঘাড় নাড়লে। না-না-না। অর্থাৎ সে ওই বাসিনীর সঙ্গেই আছে। সে কাস্তে মাথাল নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে উঠানে পিসী গোবর মাখছিল।

সে বললে—দীনু ! বোলপুর থেকে কাল একটুকুন তামাকপাতা এনে দিস বাবা।

—আনব। সে চলে গেল।

হেসে পিসী বললে—স্বপনের কথা শুনলি বাবা?

দীনু তখন চলে গিয়েছে।

কিন্তু পিসী বলেই গেল—ভোর বেলার স্বপন। উ মিছে হয় না। সি ইবারে আসবে। আসবে।

রাত্রে বোলপুর প্লাটফর্মে বাসিনী একটা জায়গায় বসে একজন ছোকরার সঙ্গে চা-খাচ্ছিল, বিড়ি খাচ্ছিল, আর হি-হি করে হাসছিল। ছেলেটা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল।

ছোকরা বললে—হাসছ ক্যানে?

—হাসছি ক্যানে? মনে হচ্ছে! ওই কথাই সবাই বলে হে!

—সবাই বলে?

-হ্যাঁ—সব্বাই। আমি কী বলি জান?

—কী?

বাসিনী গলা বাড়িয়ে তার মুখের কাছে মুখ এনে গুনগুন করে গেয়ে দিলে—নিত্য নতুন ফো-টে শালুক বাসী ঝরে গেলে হে! বলে সে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসি মাঝপথেই থেমে গেল। নীল যমুনার জলে হে!

হঠাৎ অদূরে কোন অন্ধকার স্থানে ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো চিৎকার উঠল।—আঁ—

চমকে উঠে থেমে গেল বাসিনী। চমকে উঠল লোকটাও। পিছনে প্লাটফর্ম থেকে লোকজন ছুটে এল—এই—এই - এই।

—কী হল? কী হল?

বাসিনী উঠে দাঁড়াল। অন্যদিকে চিৎকার উঠছিল—খুন করে ফেলাব। আঁ—!

আর শব্দ উঠছিল—প্রহারের!

সে কণ্ঠ দীনুর। সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কণ্ঠের চিৎকার—বুড়ো বদমাস! এই—এই—এই!

আবার কেউ বললে—ছাড়—ছাড়! ছাড়!

বোলপুর পোস্টাপিসে দীনু মাথা হেঁট করে উপু হয়ে দুই হাতে মাথা ধরে বসে ছিল।

তার কপালের একজায়গা ফুলে উঠেছে। একটা জায়গা কেটে গেছে।

অন্য একজন তরুণ রানার, তার চুল বিশৃঙ্খল—শরীরে আঘাতের চিহ্ন। সে বলছিল—ও একটা বদমাস মেয়ে—নচ্ছার মেয়ে—ভিক্ষের নাম করে শয়তানী করে বেড়ায়। ওই ছেলেটা ওর বেজন্মা ছেলে। তিন বার ছেলে ফেলে পালিয়েছে। ওর পাশে ওই বুড়ো ঘুরঘুর করছিল—তাই হেসে আমি বলেছিলাম একটা কথা! হুজুর আমার ওপর একবারে—ক্ষ্যাপা ভালুকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল—।

মাস্টার বললেন—ছি—ছি—ছি! দীনুর মতো লোককে এই কথা তুমি বলেছ? ছি—ছি—ছি। ও অতি সজ্জন লোক!

দীনু এবার বললে—হুজুর—ওই সব্বনাশী আমার ছেলেকে ভুলিয়েছিল—ওর তরেই সে—।

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

একটু থেমে বললে—আমার পরিবার আর বাঁচবে না। সে

বলেছিল—ওই মেয়েটারে একবার শুদিয়ো উ যদি জানে—সি কোথা আছে। তাই—।

—ছি-ছি-ছি। তুমি ক্ষমা চাও দীনুর কাছে। ক্ষমা চাও।

দীনু বলে উঠল—না, বাবু না। না—না। বাবু না।

উঠে সে ছুটে পালিয়ে গেল যেন। মাস্টার ডাকলেন—দীনু—দীনু!

নদীর ধারে সামনে খানিকটা জঙ্গল।

সুরেশ ঝাঁড়ুজ্জে দাঁড়িয়ে ডাকছিল—দীনু—দীনু! দীনু!

জঙ্গলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল দীনু।

তার মূর্তি রুক্ষ-শোকাচ্ছন্ন—কপালে সেই আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু মুখে উদাসীন প্রশান্তি। গায়ে একটা গামছা জড়ানো।

—বাবু! আপনি! এই শ্মশানে ছুটে এয়েছেন?

—শুনে থাকতে পারলাম না রে! কাল থেকে বাড়ি ছিলাম না। আজ দশটায় বাড়ি ফিরে শুনলাম—

—হ্যাঁ বাবু,—সত্নু খালাস পেয়েছে। কাল ভোরে স্বপন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আজও আবার ভোর বেলাতে নাকি তেমুনি স্বপন দেখে ধড়মড় করে উঠে দুয়োর খুলতে যেয়েছিল নিজে—বুকে বেথা ধরে—। স্তব্ধ হয়ে গেল সে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ হেসে বললে, আমি এসে মরা মুখটাই দেখলাম।

সে তাকাল এবার পাশের দিকে।

সেখানে চিতা জ্বলছিল। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

দীনু সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে—মাস্টার বাবুর ছেলের চিঠি এয়েচে আজ?

--হ্যাঁ। পাটনা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। গবরমেণ্ট তো সব ছেড়ে দিচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছে সব।

—নেতাইয়ের খবরও তুই পাবি। বুঝলি। আমার মন বলছে রে! বলেই সে অপ্রতিভের মতো হয়ে গেল। বললে—মানে এইবার তো ইংরাজরা চলে যাবে শুনছি। তখন দেশ স্বাধীন হলে সব মাপ করে দেবে কি না! নিতাইয়ের তখন আর ভয় থাকবে না।

—কে জানে মশায়!

বাঁড়ুজ্জে বললে—এবার তু—। বলেই থেমে গেল।

দীনু প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে?

—কাজ ছেড়ে দে। পেনসন নে।

—কাজ ছেড়ে কী করব? দিন কাটলে, রাত কাটবে না যে। সে গভীর' নৈরাশ্যে আকাশের দিকে তাকালে—তাকিয়ে থেকেই রেতে বাড়িতে একা জেগে থাকব গেরাম পিথিমী ঘুমুবে! না সে আমি লারব! সন্থ সরে গেল বাবু ওই করে। একটু থামল, আবার বললে। এ—কেটে যায়—ডাক নিয়ে যাই আসি। বেশ একটু বেপরোয়া হয়েই বললে—বেশ কাজ বাবু। পিথিমীর সুখ-দুঃখের খবর আনি—আমার কিছু নাই।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল—দীনুর বাড়িতে দীনু উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। পিসী বসে আছে দাওয়ায়।

সে কাপড়ের আঁচলে চোখে মুছচে।

তিনজন গোরু বাছুরের পাইকার অর্থাৎ দালাল—চারটি গোরুর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এক গোছা দশ টাকার নোট গুনছে।

দীনু গোরু বাছুরগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে।

নোটগুলি দীনুর হাতে দিয়ে লোকটি বললে—গুনে নাও।

দীনু গুনলে না। হাতে ধরে রেখেই বললে—ঠিক আছে ভাই।

লোকটি সঙ্গীদের বললে—চল।

একজন হাতের লাঠি উঁচিয়ে বললে—হেট্ -হেট।

দীনু বললে—দাঁড়াও।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই সে বললে—আল্লার নাম নিয়ে কসম খেয়েছ—মনে আছে তো?

—তোবা তোবা। তাই মনে না থাকে? তোমার গোরু কসাইয়ের হাতে দিব না। গেরস্তকে বিক্‌রি করব। তাও ভদ্দর ঘরে যারা নিজের হাতে গোরুর সেবা করে না তাদের দিব না। গরিব চাষীর ঘরে দিব। গোরু যাদের ধন! খোদা কসম! তোমার তুখ কি আর বুঝি না!

দীনু আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বললে—আর একটি কথা। তোমরা দাঁড়াও। আমি হস্কা পেটি নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাই—তারপরে নিয়ে যেও!

সে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

দাওয়ায় উপবিষ্ট পিসী এবার বললে—সব বিচে দিলি বাবা! আমি যা হোক তা হোক করে সেবা করতাম।

—না পিসী! সে তোমারও কষ্ট ওদেরও কষ্ট! আর গাই ছিল সতুর! বলদ ছিল নিতাইয়ের—

বলতে বলতে বেরিয়ে এল—উঠানে নামল। বললে—তারাই নাই—আর—বন্ধন রেখে কী হবে—?

কথাটা শেষ হল তার বাড়ির বাইরে।

পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে।

মাঠের পথে দীনু পশ্চিম মুখে হনহন করে গিয়ে—বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন দীনুর বাড়িখানি প্রায় জনশূন্য! পাইকারেরা গোরু নিয়ে চলে গেছে। বুড়ী পিসি একা জরতীর মতো বসে আছে। স্তব্ধ। চোখে জলের ধারা। একটা কুকুর বসে আছে। অন্ধকারে ঢেকে আসতে আসতে ঢেকে গেল পরিত্যক্ত বাড়িটা।

পরের দৃশ্যে বোলপুর স্টেশনের প্লাটফর্মের সেই লাইটপোস্টের নিচে একজন ডাকহরকরা এসে গামছা দিয়ে ঠাঁইটা পরিষ্কার করে—বসতে গিয়ে চারিপাশ তাকিয়ে দেখে দীনুকে না-দেখে ডাকলে—দীনু দাদা! ওই! কোথা গেলে হে?

দীনু তখন ওভারব্রিজের নিচে অন্ধকারে একলা বসে আছে!

ডাকহরকরাটি তার সামনে দিয়েই চলে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকলে —দীনু দাদা!

দীনু উত্তর দিলে না।

লোকটি বললে—ভ্যালা মানুষ! শোকাতাপা মন নিয়ে—চাকরি করাকেও বলিহারি যাই! আর কাজই যদি করবি—। সে চলল এগিয়ে—দীনু দাদা!

দীনু উঠে পড়ল।

বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

এসে ঢুকল থার্ড ক্লাস ওয়েটিং শেডে।

শেডে তখন খুব হাঁক-ডাক নাই।

যাত্রীরা ঘুমুচ্ছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে। নানান ভেণ্ডারেরা বসে আছে।

দীনু চলেছিল স্টলের দিকে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

একজন কুলী শুয়ে আছে আর বাসিনীব ছেলেটা তার পা টিপছে।

দীনু স্টলের পথ ভেঙে এসে দাঁড়াল কাছে।

—এই ছেলে!

ছেলেটা চমকে উঠল। তার মুখের দিকে তাকাল সবিস্ময়ে।

—উ কী হচ্ছে? অ্যা?

--পা টিপছি!

—পা টিপছিস?

—হ্যাঁ—পয়সা দেবে একটো!

—পা টিপছিস? একটো পয়সা দেবে? কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হঠাৎ বলে উঠল—শূয়ারের বাচ্চা! অধমের চারা!

কুলীটা উঠে বসল।

সকলে সচকিত হয়ে উঠল।

কুলীটা বললে—কেয়া হুয়া? কেঁও গালি দেতা হ্যায় উস্কো?—

দীনু ভ্রুক্ষেপ না করে বললে—তোর মা কোথা?

ছেলেটা বললে—মা কোথা চলে যেয়েচে একটো নোকের সঙ্গে।

শ্রোতারা হেসে উঠল।

দীনুর কণ্ঠস্বর সে হাসিকে ছাপিয়ে উঠল—তু মরে যা! তু মরে যা। তু মরে যা!

বলতে বলতে সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল—মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

প্লাটফর্মের একপ্রান্তে তখন সঙ্গী ডাকহরকরা ডাকছিল—দীনু দাদা হে!

ডাকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

সে ঘুরল! ট্রেনের সার্চলাইটে আলোকিত প্লাটফর্মে মানুষেরা জেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সেই ট্রেন থেকেই নামল—পোস্টমাস্টারের ছেলে অমর।

ঘণ্টা বাজল—হুইসিল বাজল।

ট্রেন চলে গেল।

ডাকব্যাগের ঠেলা গাড়ি এসে দাঁড়াল শহরের পোস্টাপিসের সামনে।

সঙ্গে পিওন এবং দ্বিতীয় ডাকহরকরা।

পিওন হেঁকে ডাকলে—দীনু! মাস্টারবাবু, দীনু ইস্টিশান থেকে—

ভিতর থেকে মাস্টার বললেন—এসেছে সে। শরীর খারাপ বলে চলে এসেছে! তার জন্যে ভেবো না।

অন্য ডাকহরকরা ইতিমধ্যেই এগিয়ে এসেছিল। ডাকব্যাগগুলি নামাতে নামাতে একজন বললে—সে একবারে ক্ষ্যাপাধ্যাপার মতন এসে ধপাস করে বসে পড়ল।

আর একজন বললে—এতক্ষণে একটুকুন ভোর হয়েছে। নব-গেরামের মাস্টারবাবুর ছেলে এয়েছে এই ট্যানে। সেই অমরবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

আর একজন বললে—যুজিষ্টির এইবার স্বগ্যে যাবে। আর বেশীদিন লয়!

ভিতরে ডাকঘরে খটখট শব্দে ছাপ পড়তে লাগল।

বারান্দার আর একদিকে—দীনু তখন অমরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

অমর হেসে বললে—এমন করে কী দেখছ দীনু? আমি কি খুব পাল্টে গেছি?

দীনু বললে—আপনি অ্যানেক সোন্দর হয়েছেন বাবু!

অমর বললে—বড় হয়েছি যে অনেক। তা ছাড়া জেলে তো খুব কষ্ট ছিল না!

দীনু বললে—ধরমের দয়া বাবু! কষ্ট দেয় কে?

অমর বললে—আমি জানতাম বোলপুরে নেমেই তোমার দেখা পাব!

—কী আর করব বাবু ? চিনির বলদের মতন—পিথিমীর খবর বয়ে নিয়ে যাই। আমারই শুধু—

—আমি সব শুনেছি দীনু। বাবা আমাকে লিখেছিলেন। তুমি সৎলোক, সাধুলোক—

—না—বাবু। মিছে কথা !

—দীনু ?

—ঠিক বলছি বাবু। চোরের বাবা কখনও সাধু হয় না—সাধুর বেটা কখনও চোর হয়! হয় না বাবু হয় না! সব মিছে কথা !

ঠিক এই সময়টিতেই পোস্টাপিসের ভিতর থেকে পোস্টমাস্টার হেঁকে বললেন—

—ওরে দীনু ! ওরে- তোর নামে যে রেজেষ্টারী ! অ্যাঁ !

দীনু চিৎকার করে উঠল—অ্যাঁ, আমার ?

মাস্টার একটি পার্শেল হাতে ধরে বললেন—হ্যাঁ তোরই তো। দীনবন্ধু দাস। ফাদার অব নিতাই চরণ দাস—।

—নিতাই চরণ দাস ! নিতাই পাঠায়েছে ? নিতাই ?

—না। বলছে—দীনবন্ধু দাস—নিতাই চরণ দাসের পিতা। পাঠাচ্ছে এক জাহাজ কোম্পানী।

—জাহাজ কোম্পানী ?

—হ্যাঁ ভারত জলযান কোম্পানী। বম্বে।

—কিন্তু নিতাই চরণ দাসের নাম ক্যানে রয়েছে ?

—হয়তো নিতাইই কিছু পাঠিয়েছে; জাহাজ কোম্পানী ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

—তা হলে—! তা হলে নিতাই—। নিতাইকে কোম্পানী ছেলেমানুষ বলে মাপ করেছে?

—কী করে বলব বল না দেখে!

—খুলুন বাবু, খুলুন! খুলে দেখুন?

—কিন্তু এ যে তোকে তোর পোস্টাপিস থেকে নিতে হবে। এখানে আমি কী করে খুলব!

দীনু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—না, নিতাইকে জাহাজ কোম্পানী ধরেছে? তার বিচার হবে? শিগ্‌গিরি ডাকটা বেঁধে দ্যান বাবু। শিগ্‌গিরি—।

ডাক ঘাড়ে করে দীনু ছুটছে।

তার চোখের উপর—মাস্টারের হাত এবং হাতে পার্শেলটা ভেসে ছুটে চলেছে।

হটাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

ডাকটা আছড়ে ফেললে।

এবং একদিন নিতাই যে-ভাবে ডাক ব্যাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তেমনি ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে নিজেকে সংযত করলে। তারপর বসে হাঁপাতে লাগল। মাথার উপর দিয়ে প্যাচা ডেকে গেল। গাছ থেকে একটা ফুল খসে পড়ল। পাখি ডেকে উঠল। দীনু চমকে উঠে ডাক ঘাড়ে তুলে ছুটতে লাগল।

নবগ্রাম পোস্টাপিসের সামনে তখন বেশ একটি ভিড়।

অমর দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁড়ুজ্জে আছে। সে বলছে—Hero—শহীদ—long live অমর চন্দ্র! জিন্দাবাদ!

ঠিক সেই সময়টিতেই দীনু ডাক নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল, বললে—বাবু—বাবু—

বলতে বলতে সে ঢুকে গেল ডাকঘরের ভিতরে।

মেঝের উপর ডাক ফেলে সেও যেন ভেঙে পড়ল।

—বাবু, ডাক কাটেন। বাবু!

বিস্মিত হয়ে মাস্টার বললেন—কী রে, কী হল? এমন করছিস কেন?

—আম্মার এজেস্টালী। আমার নিতাই! আমার খবর আইচে!

—নিতাইয়ের খবর?

—হ্যাঁ। ডাক কাটেন। বাবু ডাক কাটেন!

বাইরে অমর চকিত হয়ে বললে—নিতাইয়ের খবর?

বাঁড়ুজ্জে বললে—রেজেস্ট্রী?

একজন বললে—নিতাই ধরা পড়েছে?

—সাক্ষীর শমন না কি? বাবাই তো একমাত্র সাক্ষী!

বাঁড়ুজ্জে বললে—মাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। দেশ স্বাধীন হচ্ছে।—নিশ্চয় মাপ হয়েছে।

ডাকঘরের ভেতর মাস্টার তখন একখানি মেডেল হাতে নিয়ে দেখছেন।

পার্শ্বেলটি খোলা।

দীনু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

মাস্টার পড়ছেন—Awarded to Nitai Charan Dass—for his heroic—

বাঁড়ুজ্জে অনুবাদ করলে—নিতাই চরণ দাসের বীরত্বপূর্ণ—

দীনু বললে—নিতাইয়ের মেডেল! নিতাই মেডেল পেয়েছে? নিতাই তা হলে মাপ হয়ে যেয়েছে—? বাবু?

পোস্টমাস্টার মেডেলটি রেখে—চিঠিখানা বের করে খুললেন।

দীনু নিজেই মেডেলটি তুলে নিল। দেখতে দেখতে বললে—আর কী লিখেছে বলেন? বাবু?

মাস্টার চিঠিই পড়তে লাগলেন।

—বাবু! পড়েন! বলেন! বাবু! বাবু! তবে? তবে? চিৎকার করে উঠল—ই মেডেল তবে আমার? নিতাইয়ের নাম করে দিয়েছি বলে? বাবু?

—না দীনু!

—তবে?

—এ মেডেল নিতাইয়ের। তার বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের জন্য—কোম্পানী তাকে মেডেল দিয়েছে। সে নাই। তার বাবা তুই··

—সে নাই? চিৎকার করে উঠল।

মাস্টার চিঠি পড়ে গেলেন—আপনার পুত্র নিতাইচরণ আমাদের একজন কর্তব্যপরায়ণ সাহসী লস্কর ছিল। যুদ্ধের সময় সে অনেক

বীরত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছে। সে সকলের প্রিয়পাত্র ছিল। সম্প্রতি আমাদের একখানি স্টীমার যুদ্ধের সময়ের পাতা কোনো একটি ভাসা মাইনের সংঘর্ষে জলমগ্ন হইয়াছে। সকল ব্যক্তিকে নিরাপদে নৌকায় তুলিয়া সে একা কাপ্তেন সাহেবের পাশে থাকিয়া বীরের মতো আত্মবিসর্জন দিয়াছে। সেই বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ তাহার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মেডেল—আপনার নিকট পাঠানো হইল। কোম্পানী যথাসময়ে তাহার প্রাপ্য ইনসিওরেন্স ইত্যাদির টাকা আপনাকে পাঠাইবেন।

এতক্ষণ দীনুর চোখ দিয়ে জল ঝরছিল।

গোটা পোস্টাপিসটা স্তব্ধ।

শুধু টেলিগ্রাফের পোস্টের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ টেলিগ্রাফের কলটা টক্ টক্ শব্দে বেজে উঠল।

দীনুও—জয় ভগমান? বলে উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে—বাবু—চাকরিতে আমার জবাব নিয়ে ন্যান বাবু! ব্যাস!

মাস্টার মুখ ফিরিয়ে বললেন—জবাব দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ বাবু। চাকরিতে জবাব, এস্তফা! এতকাল পিথিমীর লোকের কত খবর এনেছি, আজ আমার খবর এসেছে। নেতাই চোর হয়ে হারায়ে যেয়েছিল—সে সাধু হয়ে মরেছে, তার মেডেল এসেছে—শেষ খবর আমার। জয় ভগমান।

বলতে বলতেই সে বেরিয়ে এল।

কম্পাউণ্ডের লোকগুলিকে অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এল তার বাঁড়ুজ্জে।

সে ডাকাল—দীনু! দীনু!

দীনু তার ডাক গ্রাহ্য করলে না। সে চলতে লাগল—চলতে লাগল বোলপুরের পথে।—জয় ভগমান।

বাঁড়ুজ্জে চিৎকার করে ডাকলেন—দীনু ওদিকে কোথা চললি? দীনু! দীনু!

দূর থেকে দীনু উত্তর দিলে—বোলপুর!

পথে গ্রামের প্রান্তে বাউল গান করছিল—জনতা জমেছিল—
—তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি!
দীনু তাদের পাশ কাটিযে চলে গেল।

এল সে বোলপুর স্টেশন।
ওভারব্রিজের তলায় ঘুমন্ত ছেলেটাকে উমত্তের মতো তুলে নিলে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল—
সেই অরণ্যপথ ধরে নাতিকে কাঁধে করে সে ফিরছে।
নতুন জামা কাপড়ে সে তাকে সাজিয়েছে।
গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে মেডেল।
তার সামনে এগিয়ে আসছে পথ।
ঘন অরণ্যপথ। অরণ্যপথে কচি পাতা ধরেছে।
একখানা গ্রাম
তারপর নবগ্রাম।

নবগ্রামের বাজার।

তার পাড়া।

তার বাড়ি।

বাড়ির গাছটি ফুলে ভরা।

শূন্যলোকে বাউলের গানটি বাজছে।

খেয়া ঘাটের পারাপারে—

মাশুল দিয়ে বারে বারে—

শেষ খেয়ারই ঘাটের ধারে এলেম দেউলে দশায়—

পাওনা কিছু থাকলে এবার দাওহে রাজা মশাই।

তোমার সেই বিচারের আশায়।

সমাপ্ত